দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও তাঁর উপন্যাসের বিষয়-বৈচিত্র্য

বাংলা কথাসাহিত্যে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব খাদ্য আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ সময়ের প্রেক্ষিতে। যে সময়টাতে অশান্ত হয়ে উঠেছিল গোটা পশ্চিম বাংলা। প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গর্জে উঠেছিল বাংলার সাধারণ মানুষ। আবার কমিউনিস্ট পার্টিতেও চলছিল অভ্যন্তরীণ সংঘাত। এই সংঘাত লক্ষের নয়—পথের, উপায়ের। ১৯৬২-তে চিন-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির চীনপন্থি অবস্থান পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তোলে। এমনকি 'কমিউনিস্টরা চিনের দালাল' এমন লেখায় বাংলার দেওয়ালগুলি ভরে গিয়েছিল। যদিও সাধারণ মানুষকে এসব বলে ভুল বোঝানো যায়নি। কারণ তখনকার কমিউনিস্ট পার্টি প্রকৃত অর্থেই ছিল জনগণের পার্টি। তবে কিছু সময় পরে অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম তীব্রতর হলে অখণ্ড কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে দু-খণ্ড হয়ে যায়—C. P. I. (M) এবং C. P. I.। এই নবগঠিত পার্টির উদারপন্থি এবং চরমপন্থিদের মধ্যে অচিরেই দ্বন্দ্ব শুরু হয়। চরমপন্থি অংশ লক্ষ করলেন, পার্টির নেতাদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে তীব্র অনীহা। তাই চারু মজুমদারের নেতৃত্বে চরমপন্থি সদস্যরা দল ভেঙে তৈরি করেছিলেন C. P. I. (M. L.)। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশালবাড়িতে শুরু হয় ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন। যা বিদ্যুৎ গতিতে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। সাধন চট্টোপাধ্যায় মনেপ্রাণে কমিউনিস্ট ছিলেন। কিন্তু নকশালদের এই শোষণ মুক্ত দেশ গড়ার লড়াইয়ে সাধন চট্টোপাধ্যায়ও সামিল হয়েছিলেন। কিন্নর রায়ের কথানুযায়ী—

> "এমনকি সত্তর দশকের শেষ দিকে, আশিতেও তিনি কখনও কখনও আলট্রা লেফট। নকশালপন্থীদের কাছাকাছি।"[১]

কিন্তু ৭৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাধন চট্টোপাধ্যায় এই বামফ্রন্টকেও সমর্থন করেছেন। কারণ নকশাল আন্দোলনের নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে তিনি ভাবনা-চিন্তা করার পর নকশাল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন।

১৯৭০ সালের নকশাল আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা দখল, রাষ্ট্রের প্রত্যাঘাত এবং জেলে বন্দি হত্যা থেকে শুরু করে নানা গণহত্যা সেসময় সংঘটিত হয়েছিল। যেমন—বারাসত হত্যা (১৯ নভেম্বর, ৭০), মেদিনীপুর জেলহত্যা (১৬ ডিসেম্বর এবং ৩ ফেব্রুয়ারি, ৭১), ডায়মন্ড হারবার হত্যা (২৬ জানুয়ারি, ৭১), বহরমপুর হত্যা (২৪ ফেব্রুয়ারি, ৭১), কোন্নগর গণহত্যা (১ জুন, ৭১), বরানগর-কাশীপুর গণহত্যা (১২-১৩ আগস্ট, ৭১), হাওড়া হত্যা (১২ সেপ্টেম্বর, ৭১) ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হত্যা (২৬ নভেম্বর, ৭১), ইত্যাদি। এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় খুন এবং অজস্র ব্যক্তি খুন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভাঙার ঘটনা বাঙালি প্রজন্মকে পথের সন্ধানে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। এরপর আটের দশকের শেষে সোভিয়েত পতন এবং আদিবাসী সমস্যা, কর্পোরেট দুনিয়ার জল-জঙ্গল-খনিজ উৎস দখল, উচ্ছেদ, উন্নয়ন এবং মাওবাদী আন্দোলন বিগত তিন দশক জুড়ে বাঙালি লেখকদের নানা প্রেক্ষিত দিয়েছে। তথাকথিত জনপ্রিয় বাজার নির্ভর লেখকরা সমস্যাগুলো এক ভাবে দেখলেন, অপরদিকে আশি-নব্বই-শূন্য দশকের তরুণত্বর লেখকরা নানা কৌণিক অবস্থান থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। চূড়ান্ত বাণিজ্যিক সফল ছিলেন সমরেশ মজুমদার—'কাল বেলা' উপন্যাসটি লিখে। সমরেশ বসু লিখেছেন 'মহাকালের রথের ঘোড়া', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'শ্যাওলা', সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন' আমি ও বনবিহারী', নবারুণ ভট্টাচার্য লিখেছেন 'হার্বার্ট', শৈবাল মিত্রের কলমে 'তরণী পাহাড়ে বসন্ত' এবং আরও অন্যান্য রচনা আমাদের নজরে পড়েছে। নব্বই এবং শূন্য দশকে উন্নয়ন, আদিবাসীদের জমি থেকে উৎখাত, মাওবাদ প্রভৃতি নিয়ে N. G. O. সংক্রান্ত নানা সম্পর্কযুক্ত সামাজিক ব্যাপারগুলি বাংলা উপন্যাসের বিষয় হিসেবে কিছু কিছু উপন্যাসে উঠে আসতে দেখা গেল। যেমন শীর্ষেন্দু দত্তর 'বৃত্তের মধ্যে' এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি শক্তিশালী কলম নিয়ে কিছু লেখিকা উপরোক্ত বিষয়গুলোর সঙ্গে নারী স্বাতন্ত্র্যবাদকে তুলে আনলেন। যেমন স্বাতী গুহ, সায়ন্তনী নাগ, অহনা বিশ্বাস, অনিন্দিতা গোস্বামী প্রমুখ। দলিত সাহিত্য বা নিম্নবর্গীয়দের কথা নিয়ে আখ্যান রচনায় প্রবণতা বেশ জোরালো হয়ে উঠতে দেখে আশি-নব্বই ও শূন্য দশকে। যেমন অনিল ঘড়াই, যতীন বালা, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, মনোরঞ্জন ব্যাপারী, নলিনী বেরা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে গত শতকের আশি ও নব্বই দশক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সময়। অর্থাৎ সব কিছু বাজার সূচকে ঢুকে পড়ায় নন্দনতত্ত্ব থেকে মানুষের সকল সুকুমার

বৃত্তি প্রায় এক অন্ধ বিন্দুতে ঢুকে পড়েছে। পুরনো ধ্যান-ধারণাকে নির্দয়ভাবে বাতিল হতে দেখা গেছে, কিন্তু বাঙালি লেখক নিকট ও দূরের ইতিহাসকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখতে চাইলেন। উপন্যাসের আখ্যানে তাদের প্রয়াস ধরা পড়লো। বাঁশের কেল্লা বা তিতুমীরের লড়াই, তেভাগা আন্দোলনের ইতিকথা, এমনকি মধ্যযুগের তিন মঙ্গল কাব্যের মধ্যেও আধুনিক দৃষ্টিতে খোঁজ চলল। গত তিন দশকের বাংলা উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—পরিবেশ দূষণ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অর্থাৎ যে যে আধুনিক চিন্তাধারাগুলো সেসময়ে মানুষের চেতনাকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে, বাঙালি লেখকরা সেই বিষয়গুলোকেই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আখ্যানের উপজীব্য বিষয় করার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কিন্নর রায়ের 'ধূলি চন্দন', 'মেঘ মাতাল', অমর মিত্রের 'কৃষ্ণ গহ্বর' এবং সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির'।

গত তিন দশকে পশ্চিম বাংলায় প্রধান প্রধান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক যে পরিবর্তনগুলো ঘটেছে তা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মনকে আলোড়িত করেছে এবং বাজার ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিস্ফোরণে মানুষের নতুন নতুন উপলব্ধি, রুচি পরিবর্তন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, পরিবেশ দূষণ থেকে জনস্বাস্থ্য, বিজ্ঞাপন, ভোগ্য পণ্যের চাপ থেকে উদ্বুদ্ধ নতুন নতুন সমস্যা, খাদ্যাভ্যাস, বদলে যাওয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাসস্থানের প্যাটার্ন পরিবর্তন অর্থাৎ যা যা গত তিরিশ বছরে দ্রুত ঘটে গেছে মানে নগরায়ন থেকে হিংসা, সন্ত্রাস, অমানবিকতার নিত্য ঘটনা, লিঙ্গ সন্ত্রাস থেকে শুরু করে যৌন দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন—সমস্তটাই তাঁর আখ্যানের উপজীব্য বিষয়। শৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কাহিনি বয়নের নতুনত্ব, আখ্যানে রহস্যময়তায় তাঁর উপন্যাস নানা বিচিত্র পথগামী হয়েছে। বিগত তিন-তিনটি দশকে ভূমি-সংস্কার, পঞ্চায়েত শক্তির বিকাশ, C. P. I. রাজনৈতিক দলটির সংগঠন ও ক্ষমতা বিস্তারের মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলার পুরনো কাঠামো ভাঙতে শুরু করেছিল—প্রচুর অর্থ, ক্ষমতা, নির্বাচন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নানা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার নানা আয়োজনে নতুন নতুন শ্রেণিবিন্যাস, ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে ওঠা ও পুরাতন মূল্যবোধের ভাঙনে গ্রামীণ চেতনার পরিবর্তন সূচিত হলো। শ্রম-বাজার-নারীর স্বতন্ত্র ও অধিকারবোধই পুরনো দিন আর টিকে থাকলো না। তবে এই প্রগতি কখনোই সরল, একমুখীন ভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। ইতি ও নেতি দুটোই জড়িয়েছিল।

রাজনীতিবিদরা দলীয় চশমায় চোখ রেখে এই পরিবর্তনগুলো বিচার করে থাকেন। শুধুমাত্র সৃষ্টিশীল মানুষেরাই পূর্ণ সত্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করে থাকেন। সেজন্যই বাংলা গল্প উপন্যাসে নতুন গ্রামের ছবি, রাজনৈতিক বিন্যাসের জটিল রূপ তুলে ধরবার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে। যেমন সাধন চট্টোপাধ্যায় নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সংগঠন বৃদ্ধির কথা, ক্ষমতার কথা, কৃষির রূপান্তরের কথা উচ্চারণ করেছেন তাঁর আখ্যানে। সেই সঙ্গে মানুষের রাজনৈতিক মূল্যবোধ নিয়েও তাঁকে প্রশ্ন তুলতে দেখা গেছে। অর্থাৎ গত চার দশকে বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন।

সাধন চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসগুলিকে এভাবে বিন্যস্ত করা যায়—

১. রাজনীতিমূলক উপন্যাস : 'পক্ষ বিপক্ষ' (১৯৮৮), 'অগ্নিদগ্ধ' (১৯৬৯-১৯৭০), 'মাটির অ্যান্টেনা' (২০০০)।

২. ইতিহাস ও সংস্কৃতিমূলক উপন্যাস : 'পানিহাটা' (২০১৪), 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে' (২০১২), 'সাতপুরুষ ডট্ কম' (২০০৫)।

৩. জীবন-জীবিকা ও সমাজ-জীবনমূলক উপন্যাস : 'গহিন গাঙ' (১৯৭৯), 'পিতৃভূমি' (১৯৮৫), 'দুই ঠিকানা' (১৯৮২),'উদ্যোগ পর্ব' (১৯৮২)।

৪. বর্তমান সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলক উপন্যাস : 'ধরিত্রী' (২৯৯৭), 'তেঁতুল পাতার ঝোল' (১৯৯৩-৯৫)।

৫. দেশ-কাল ও পরীক্ষামূলক উপন্যাস : 'পাল্টিপুরাণ' (২০০১), 'গুল্মলতার ইলেকট্রন' (২০০৩), 'কী বলে, মৃত্যুলগ্নে?' (২০০৩), 'দিন আনে দিন খায়' (২০১৫)।

৬. পরিবেশ সচেতনতামূলক উপন্যাস : 'জলতিমির' (১৯৯৯), 'বিন্দু থেকে বৃত্ত' (২০০০), 'শেষ রাতের শেয়াল' (২০০৩), 'পানিহাটা' (২০১৪)।

পক্ষ বিপক্ষ : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'পক্ষ বিপক্ষ' উপন্যাসটিকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। এটি ১৯৮৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'পক্ষ বিপক্ষ' উপন্যাসটি একটি নির্দিষ্ট সময় ও সমাজের প্রেক্ষাপটের ভাষিক নির্মাণও বলা যেতে পারে। কারণ বিগত আটের দশকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পরিসরই হলো আলোচ্য উপন্যাসের মূল পটভূমি। ১৯৭৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের স্বৈরাচারী ও অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে নতুন ভাবে পথ চলা শুরু হয় বামফ্রন্ট সরকারের। আর রাজ্যের এই পরিবর্তিত পটভূমির প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরতে সাধন চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর লেখনীতে শান দেওয়ার চেষ্টা করেন। অকপটে তুলে ধরেন পরিবর্তিত রাজনৈতিক পালাবদল এবং মানুষের শ্রেণি বিভাজনের চিত্র অর্থাৎ শ্রেণি সম্পর্কে এক নতুন চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। বামফ্রন্ট সরকার ভোটের আগে জনগণকে বিভিন্ন সভায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নতুন সমাজ গড়ার এবং শুধু তাই নয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন করার কথাও বলেছিলেন। এই পরিবর্তনের হাওয়া দেওয়ার জন্যই পশ্চিমবঙ্গে চালু হয় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও ভূমি-সংস্কারের মতো মূল্যবান বিল। ক্ষমতা যেন এককেন্দ্রীভূত না হয়ে বিকেন্দ্রীকরণ হয় সেটার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। রাজ্যের গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষ আশায় বুক বাঁধে উন্নয়নের লক্ষে। কারণ এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ফলে গ্রামের মানুষ হয়ে উঠবে নিজের ভাগ্যের নিজেই নিয়ন্ত্রক। এক্ষেত্রে মানুষ নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ততায় উন্নয়নের শরিক হয়ে ওঠে। কেননা সরকারের সেই ভূমি-সংস্কারের মতো দুরন্ত কার্যক্রমের ফলে 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই স্লোগানে ব্যাপক ভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাজে অগ্রগতি পায়। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে কংগ্রেসি আমলের জমিদারিকে ছিন্নমূল করে খণ্ড খণ্ড ভাবে সেই জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টিত করে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেখা যায় বর্গাদারী ব্যবস্থা। গ্রাম বাংলার বাসস্থানহীন ও দুর্গত গরিব মানুষদের জীবনে চলে আসে এক স্বস্তির হাওয়া। কিন্তু পরিবর্তনের সেই সুখ ও স্বস্তিকে তাড়াতাড়ি গ্রাস করে ফেলে কিছু রাজনৈতিক সুবিধাভোগী মানুষ তাদের নিজেদের স্বার্থে। ব্যক্তিস্বার্থের জন্য রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করে দুর্নীতির বাতাবরণ চালু হয়ে যায়। অবশেষে ক্ষমতাসীন দল অর্থাৎ শাসক দলের শিরায় শিরায় দুর্নীতি ও দম্ভের বিষ প্রবেশ করতে শুরু করে দিল। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে শুরু হয়ে যায় কাটমানি নেওয়া, উন্নয়নের

বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করা, সর্বশেষে স্বজনপোষণের মতো একটা আদর্শহীন কর্মের অন্তহীন পালা। শাসকদলের প্রায় প্রতিটি স্তরেই দেখা যায় স্বার্থের সংঘাত। তৈরি হয় দল বদলে 'লবি'। কার্যত এইভাবে দলের মধ্যে তৈরি হয় এক একটি উপদল। যে কারণে কংগ্রেসকে তাড়িয়ে বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে রাজ্যের মানুষ, অবশেষে সেখানেও অনাচারের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয় বাংলার এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। 'পক্ষ বিপক্ষ' উপন্যাসে লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার এক বিশ্বস্ত দলিল তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

উপন্যাসের সূচনাতে উপস্থাপিত হয়েছে কালনা ২ নং ব্লকের যুগবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড মিটিংয়ে প্রধানের বিরুদ্ধে বিষোদগার দিয়ে। মোক্ষম সব অভিযোগ করছে সরকারি দলের পঞ্চায়েত প্রধান বাদল কর্মকারের বিরুদ্ধে নিজের দলেরই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গোকুল ভাঙ্গি। দুইয়ের বাকবিতণ্ডায় জমে উঠছে উত্তপ্ত সেই বোর্ড মিটিং। পঞ্চায়েত প্রধানের বিভিন্ন রকম কারসাজি ও দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছেন গোকুল। কিন্তু স্থানীয় বামপন্থি আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ যিনি বিভিন্ন লড়াইয়ের সাক্ষী ছিলেন সেই গগন ভাঙ্গির ছেলে হওয়ার সুবাদে বাদল কর্মকার সমস্ত ক্রোধ চেপে যায় এবং প্রকাশ্যে কিছু না বলার অদ্ভুত মায়া মন্ত্রে নিজেকে সংযত করেছেন। এরকম দোলাচলের মধ্যে সেদিনকার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বোর্ড মিটিং আপাতত স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। লেখক এই গ্রাম পঞ্চায়েতকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের সত্তরের দশকের এক জটিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অনুসন্ধান করেছেন। আর সমাজমনস্ক এই শিল্পীর লেখার ক্ষেত্রে যে দায়বদ্ধতা তার জন্যই সাধারণ পাঠক সমাজকে আরও বেশি আকৃষ্ট করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আখ্যানে দেখা যায় উপন্যাসের আর এক অন্যতম প্রধান চরিত্র স্কুল শিক্ষিকা দুলালীকে। যুগবেড়িয়া পঙ্কজিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা দুলালী, সেখানেই তার কর্মস্থল। কর্মের বিনিময়ে প্রত্যেক মাসে তার বেতন হাতে আসে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্লাসের পরেও তার প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ লক্ষ করা যায়। জীবন বিজ্ঞানের দিদিমণি দুলালী রবীন্দ্রজয়ন্তী কিংবা বছরে দু-বার দীর্ঘ অবকাশে এক আধটু ফাংশনে ছেলে-মেয়েদের মাতিয়ে তোলে। এর ফলে প্রশংসা ও সমালোচনা দুই-ই মিলে আড়ালে-আবডালে তার ভাগ্যে। গ্রীষ্মের ছুটির দিনে সদ্য স্কুলে ফাংশন শেষ করে টিচার্স রুমে ঢুকে দুলালী তার সহকর্মীদের কাছ থেকে পায় শীতল অভ্যর্থনা।

অর্থাৎ হেডমাস্টার সহ দু-চার জন কলিগ দুলালীর সঙ্গে অন্যান্য দিনের মতো সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করলো না। যেন নিঃশব্দে এড়িয়ে গেল তাকে খানিকটা। কোথায় যেন গিঁট বেঁধেছে। শুধু বুঝতে পারে না তার সঙ্গে স্কুলের মাস্টারমশাইদের এই ঠাণ্ডা ব্যবহারের তাৎপর্য। সে মনে করে প্রশান্ত শিকদার ও অনুপম তার পরিবারের সঙ্গে একই রাজনৈতিক বৃত্তে। কেননা দাদু বিভূতি মণ্ডলের মায়ের নামে স্কুল, ফাউন্ডার মেম্বার হিসেবে মামা শচীনন্দন আজ পর্যন্ত কমিটির মেম্বার তাহলে কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই আচরণ তার সদুত্তর নেই। অবশেষে বাড়ি ফিরে সে বেরিয়ে পড়ে পার্টির সতীর্থ ছেলেবেলার বন্ধু গোকুলের সঙ্গে দেখা করতে। গোকুলের বাড়ি মাধবপুর, সেখানে হেঁটে পৌঁছতে আধ ঘণ্টা সময় লাগে। এটি পঞ্চায়েতের একেবারে প্রান্ত গ্রাম। সেখানে পৌঁছে দেখে গোকুল তার নিজ ব্যবসার কাজে ব্যস্ত। গোকুল দুলালীকে কাছে পেয়ে জানায় সেই বোর্ড মিটিংয়ে বাদলের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডার কথা—

> "এসব নোংরামি মুখ বুজে সহ্য করতে বলিস? আরও মারাত্মক অভিযোগ আর ষড়যন্ত্র আছে, এখানে রাস্তায় বলা যাবে না, শুনলে রক্ত তোর গরম হয়ে যাবে। সরকারের গণমুখীন নীতির সাড়ে সব্বনাশ করছে আমাদের দলেরই একাংশ। বাহাত্তরে এরা ছিল কোথায়? যখন হাজার হাজার কমরেড মরল?"[২]

পরক্ষণেই দুলালী বুঝতে পারে যে, সে মণ্ডল বাড়ির মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও ভেতরে ভেতরে এ লড়াইতে গোকুলদের পক্ষে ছিল বলে ওদের স্বার্থ সম্মানে বাঁধছে। এরপর এই সংঘাত পৌঁছে যায় দলীয় কোন্দল থেকে উপদলের মধ্যে। আখ্যানের বিষয় এগিয়ে যায় দ্বৈত মাত্রা নিয়ে। যেমন একদিকে গোকুলকে ঘিরে জমে ওঠে উপদলীয় কোন্দল, অন্যদিকে সমান্তরাল ভাবে চলে গোকুল-দুলালীর সম্পর্ক। গোকুল ও পশুপতি পার্টির জন্মলগ্ন থেকে সঙ্গে থাকলেও ধীরে ধীরে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত বাদল কর্মকার, ধ্রুব গুপ্ত, প্রশান্তরা রাজনীতিতে অনেক পরে আসা সত্ত্বেও ক্ষমতার স্বাদের লোভে দলের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। তারা এসেই সংগ্রামী গরিবদের বিপক্ষে ঠেলে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করেন। পার্টির দুর্দিনে এরা সঙ্গে না থাকলেও শেষমেশ পার্টি ক্ষমতায় আসার পর এরাই ক্ষমতাকেন্দ্রের দখল নেয়। তবে তারা শত চেষ্টা করেও গোকুলকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করতে পারে না, কারণ কংগ্রেসি রাজত্বের অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা গগন ভাঙ্গির

সন্তান সে। গগন ভাঙ্গির রাজনৈতিক ইমেজ এখনো মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। গোকুল সেটা জানে বলেই সেদিন প্রধানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বোর্ড মিটিংয়ে বোমা ফাটাতে দ্বিধাবোধ করেননি। এরপর ধীরে ধীরে পার্টির ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী গোকুলদের কোণঠাসা করবার নীতি গ্রহণ করেন। তারাও বিভিন্ন অভিযোগ আনতে শুরু করেন গোকুলের বিরুদ্ধে। গোকুল আঞ্চলিক খেতমজুর সংঘের কর্তাব্যক্তি। এদের শক্তির ভিত্তিতেই এলাকায় পার্টির প্রভাব বাড়ে। খাসজমি উদ্ধার, বর্গাদারী রেকর্ড, মজুরি আদায় থেকে সিলিং ফাঁকি না দেওয়া প্রভৃতি কাজগুলো একমাত্র সম্ভব হয়েছিল গোকুলদের এই সক্রিয় রাজনীতির সহযোগিতায়। তাই প্রশান্ত উৎপলদের পছন্দের না হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ নেতৃত্ব গোকুল পশুপতিদের কখনো ছোটো করেনি। এর ফলে একই মেরুতে দুই শক্তির লুকোচুরি খেলা চলে, যা আভ্যন্তরীণ ভাবে কখনো কখনো আড়ালে-আবডালে একে অপরকে রাজনৈতিক ভাবে দেখে নেওয়া এবং পাল্টা দেখে নেওয়ার খেলা শুরু হয়ে যায়। লেখকের মতে, বামফ্রন্ট সরকার সাতাত্তরে বিভিন্ন সংগ্রাম ও কতো রক্ত ঝড়িয়ে বাংলায় আসীন হয়েছিল। আর তা থেকেই সমাজের মেহমতি গরিব মানুষজন দুর্দিনের বেড়াজাল অতিক্রম করে উত্তরণের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয় না, ক্ষমতায় আসার এক দশক যেতে না যেতেই পঞ্চায়েত স্তর ক্রমান্বয়ে দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়। দল বদলের মাধ্যমে বেনোজলের মতো পার্টিতে প্রবেশ করে এক প্রকার স্বার্থান্বেষী মানুষ। তারাই পার্টিতে সর্বেসর্বারূপে নিজেদের তুলে ধরার চেষ্টা করে। পার্টির প্রথম দিনের সংগ্রামী, লড়াকু একনিষ্ঠ কর্মীরা আস্তে আস্তে হতে থাকে কোণঠাসা।

এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে প্রশান্ত, উৎপল, ধ্রুব প্রমুখের উত্থান এবং গোকুলের ক্রমশ কোণঠাসা ও পিছিয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে। ক্ষমতা দখল ও অর্থের লোভ লালসা যখন মানুষের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে তখনই আদর্শচ্যুত হয়ে পড়ে মানুষ। এর ফলে কায়েমি স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ক্ষমতার পরিমণ্ডলের মধ্যে একটি বিভাজন তৈরি হয়ে যায়। যেমন—উৎপল ও ধ্রুব এতদিন ছিল গোকুলের প্রতিপক্ষ। কিন্তু ব্যাংক লোণে উৎপল লরি কিনলে ধ্রুবর মনের মধ্যে ঈর্ষা তৈরি হয়। I. R. D. P.-তে স্যালো পেয়ে জল বেঁচে সে এখন লাল। ওপর দিকে ধ্রুব সেই লোণ না পাওয়ার কারণে উৎপল হয়ে ওঠে তার কাছে চক্ষুশূল। সে এখন বনেদি কংগ্রেসি হাজারি গুছাইতের ছেলে মহীতোষের ব্যবসার পার্টনার। যেহেতু গ্রামে গ্রামে ঘুরে পাট ও তিল কিনে তাকে বাইরে চড়া দামে

বিক্রি করতে হয় তাই এক্ষেত্রে গোকুলের সহযোগিতা তার প্রয়োজন। তাই শত বিরুদ্ধ মনোভাব থাকা সত্ত্বেও একদিকে ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং অন্যদিকে উৎপলের প্রতি তার জ্বালাময়ী ঈর্ষা এই দুটি কারণ তাকে গোকুলের দিকে যেতে বাধ্য করে। অর্থাৎ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ধ্রুব আস্তে আস্তে গোকুলের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু স্বার্থের এই গতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, বর্তমান সমাজে পক্ষ-বিপক্ষের কোনো চিরস্থায়ী অবস্থান হয় বলে কেউ মনে করতে পারে না। তাই কিছু দিন পর দেখা যায় উৎপল-ধ্রুব-গোকুলের ক্ষমতার সমীকরণের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এবার ধ্রুব আবার ফিরে যায় উৎপলের দিকে। গোকুলের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত খেতমজুরদের মজুরি নিয়ে। অথচ—

> "এ অঞ্চলের খেতমজুরদের সংগঠনটি এখনো বেশ মজবুত। সাতাত্তরের পর থেকে, এদের শক্তির ভিত্তিতেই এলাকায় পার্টি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। এই মাধবপুর, ভাঙ্গানা, জামতাগড়, ভাটপাড়া—সারা অঞ্চলেই সংগঠনের বেশ দাপট।"[৩]

এই খেতমজুরদের জন্য যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা আজ রাজনীতির শিকার। এমনকি শীতকালে তারা ফসল কাটার জন্য বেশি মজুরি দাবি করলে ক্ষমতাশালী মালিকরা তাতে সম্মতি প্রদান না করার ফলে খেতমজুর চাষিরাও বেঁকে বসে এবং বাইরে থেকে লোক এনে ফসল কাটার আগ্রহ প্রকাশ করলে খেতমজুররা বাঁধা দেয়। এর ফলে দুই পক্ষের ঝামেলা তৈরি হয় ও পুলিশ এসে বাইশ জনকে গ্রেপ্তার করে। ফলে স্থানীয় মানুষের অনশন এবং ফসল নষ্টের আশঙ্কায় মালিকরা সন্ত্রস্ত। অন্যদিকে ধ্রুব ও মহিতোষের এই অঞ্চলে জমি থাকার সুবাদে বিবাদের নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করে। এমনকি সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে পার্টির উচ্চ নেতৃত্বগণ উভয়পক্ষকে সামনাসামনি বসিয়ে বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ না হওয়ার দরুন প্রকাশ্য সভায় দুর্নীতি নিয়ে সরব হন গোকুল। শিক্ষক নিয়োগের জন্য ডোনেশন নেওয়ায় বাদল ডাক্তারের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগের তির ছোঁড়েন। এর ফলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে উঠে আসে এবং ধ্রুবর জাল ব্যবসার কারসাজিও ফাঁস হয়ে যায়। এই অবস্থায় সামনে ভোটের কথা মাথায় রেখে, বিবাদ মেটানোর চেষ্টা চালানো হয়। স্থির করা হয় পুলিশ প্রশাসনকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য করা হবে বিশাল মিছিল। গোকুল, ছকির ও মন্মথ যদিও এই মিছিলে পা মেলাননি। অবশেষে

খেতমজুরের প্রতিশ্রুতি মতো আন্দোলন তুলে নেন এবং পুলিশও কিছু আটক কর্মীদের ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা মানুষকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত করে। শুধু প্রভাবিত হয় সাধারণ মানুষ। এছাড়াও পার্টির আভ্যন্তরীণ দ্বৈত সত্তার সমান্তরালে চিত্রায়িত হয়েছে গোকুল দুলালীর সম্পর্ক। শৈশবেই পিতৃহীন দুলালী, তাই মাতুল শচীনন্দনের বাড়িতে অন্নপূর্ণার হাতে তার বেড়ে ওঠা। শচীনন্দন মণ্ডল পরিবারের সন্তান। শচীনন্দনের ছেলে উৎপল দলীয়ভাবে গোকুলের বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। তাই গোকুল ও দুলালীর সম্পর্কে শচীনন্দন ও উৎপল আপত্তি জানায়। এমনকি বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি তারা দুলালীকে দেয়। পরে শাসনের বেড়াজালে কোণঠাসা করে রাখতে চায়। পরবর্তীতে দুলালী কৌশলগত ভাবে মায়ের সম্পত্তির ভাগের পরিমাণের কথা বললে শচীনন্দন তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন এবং অনেকটাই হতভম্ব হয়ে পড়েন। সম্পত্তির উপর পুরুষতান্ত্রিক অধিকারের মূলে এই আঘাত শচীনন্দন মেনে নিতে পারেন না। ধীরে ধীরে সম্পর্কের মধ্যে একটা তিক্ততা ভাব চলে আসে। আরও একধাপ এগিয়ে গেলে দেখা যাবে গোকুলের সঙ্গে দুলালীর সম্পর্কের প্রতি ঘোরতর আপত্তির কারণ হলো, গোকুল গগন ভাঙ্গির সন্তান। আর এই গগন ভাঙ্গি ছিল বিভূতি মণ্ডলের ডান হাত। সরকারের নিয়ম-কানুন ভাগচাষির অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে খুব বেশি নিজেকে জড়াত না। বিভূতিও বিশ্বাস করে সকল বেনামি জমির ভার গগনের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই গগন ভাঙ্গি একমাত্র জানত বিভূতির যুগবেড়িয়া মৌজার পাঁচ একর বন্ধকী জমি কন্যা অন্নপূর্ণার নামে বেনামি করার কথা। বিভূতি বেঁচে থাকা অবধি কোনো অসুবিধা হয়নি কিন্তু শচীনন্দন পিতার মৃত্যু হলে সম্পত্তির মালিক গগন ভাঙ্গির বিপদ ঘনিয়ে আসে। পরবর্তীকালে সে জমির সম্পত্তির দেখাশোনার ভার দেয় বাদল ডাক্তারের উপর। গগনকে ডেকে বাদল তার ভাগ চাষের পাঁচ একর জমি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললে গগনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। এতকিছুর পরেও গগন হার মানতে চায় না। শেষে C. P. I. (M) কর্মী মন্মথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মন্মথ জানায় বর্তমানে ভূমি-সংস্কার আইন লাগু হবার জন্য বর্গা উচ্ছেদ অসম্ভব। অবশেষে মহকুমার এজলাসে কোর্ট কেস পর্যন্ত বিষয়টি এগিয়ে যায়। সেখানেও দেখা যায় গগন ভাঙ্গির অর্থের বিনিময়ে স্বেচ্ছায় বর্গাদারী স্বত্ব ত্যাগ করার স্বীকারোক্তির কথা।

এরপর রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মধ্যে থেকে গগন ভাঙ্গির সংগ্রাম নতুন মাত্রা পায় উপন্যাসে।

অপরদিকে উৎপল এখন শাসক দলের সদস্য। সে নিজস্ব সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য সদা তৎপর। তাই মেহনতি গরিব মানুষের জীবনের সত্যিকারের শরিক গোকুলের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতার মনোভাব পোষণ করেন। এটাও সত্য যে গোকুলের কারণেই দুলালীকে স্কুলে প্রতিপদে অপমানিত হতে হয়েছে এবং প্রেসিডেন্টের কন্যাকে বেয়াদবির জন্য দুলালীর বিরুদ্ধে হেনস্থার মতো মিথ্যা অভিযোগও আনা হয়। অপরদিকে গোকুলকে পাখির সঙ্গে সম্পর্কের মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে তার চরিত্রের মধ্যে কলঙ্কের দাগ লাগানোর চেষ্টা করা হয়। অতএব বলা যায়, আলোচ্য উপন্যাসে প্রতিটি মুহূর্তে একটি রাজনৈতিক বাতাবরণ আমরা দেখতে পাই। যা সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক জটিল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এরপর বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করার পর উৎপল ভাবি পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচিত হয়। অন্যদিকে ধ্রুব এবং মহিতোষের দল বিরোধী কাজের জন্য গোকুলকে অভিযুক্ত করেছে। শচীনন্দনও শেষ পর্যন্ত জমির ভাগ বণ্টন মেনে নিয়েছেন। জমি নিয়ে বাড়ির অভ্যন্তরে সমস্যা মিটলেও রাজনৈতিক পার্টির ক্ষমতাকেন্দ্র দুলালীকে আরও বেশি কোণঠাসা করে দেয়। অর্থাৎ ক্ষমতাতন্ত্রের কাছে ব্যক্তি প্রেম প্রায় নিশ্চিত অসহায় আমাদের তা অজানা নয়। উদাহরণ স্বরূপ শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর রমা ও রমেশের প্রেমের ফলশ্রুতি তো আমরা ভুলিনি। রাজনীতির কুটিল থাবার হাতে রক্তাক্ত ব্যক্তির অসহায় আর্তনাদও আমাদের খুব ভালো পরিচিত। 'চার অধ্যায়'-এর অতীন্দ্র-এলার ঘটনা তো এখনো স্মৃতিতে সজাগ। রাজনীতির আদর্শহীনতা, বিবেকহীন, মূল্যবোধহীন ক্ষমতাতন্ত্র ও ভোগ সর্বস্ব সমাজ ব্যবস্থার হাতে বারবার বিপন্ন হয় বিবেকি মানুষ। উপন্যাসের মধ্যে এই যে পালাবদল তাকে একমুখী রঙে ব্যাখ্যা করা খুবই দুষ্কর। গোকুলের নীতির লড়াইকে যদিও বা সরল রৈখিক পথে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু দুলালীর প্রীতি ও নীতির লড়াইকে দুরধিগম্য মননে বুঝতে হয়। আখ্যানের অন্যতম চরিত্র বাদল ডাক্তার হলো কায়েমি স্বার্থের প্রতীক। অর্থাৎ দেখা যায় বদলে যাওয়া গ্রাম ও গ্রামের বিভিন্ন রঙে রাঙানো বিচিত্র কর্মকাণ্ড পক্ষ-বিপক্ষ জোটের দলভুক্ত মানুষরা করে চলেছে। এই কর্মকাণ্ডের পেছনে ঔপন্যাসিক দ্বিবিধ মানবিক ব্যক্তিকে দুই পক্ষে বলবান করেছেন। 'পক্ষ বিপক্ষ'-তে সেই লড়াইয়ের উত্তরণ ঘটেছে। এখানে সমাজ বিস্তারের প্রেক্ষিতে গোকুল দুলালী সারাটা উপন্যাস জুড়ে সেই মামলা লড়েছে। এই লড়াই একার না হয়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের হওয়ায় তা ব্যাপক হতে পেরেছে বলে আমাদের ধারণা।

মাটির অ্যান্টেনা : কথাসাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'মাটির অ্যান্টেনা' উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক পরিবর্তিত সময়ের আখ্যান বলা যেতে পারে। 'পক্ষ বিপক্ষ' উপন্যাসের মতোই আলোচ্য উপন্যাসেও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের দিকগুলি উঠে এসেছে। যেমন—উপন্যাসের শুরুতেই লেখক জানিয়েছেন—উপন্যাসের মধ্যে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি ব্যবস্থার বদল ঘটেছে। কায়েম হয়েছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা। জনসাধারণের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বেড়েছে। এক ছত্র উচ্চবর্ণের ডমিনেশনের বিপরীতে সংরক্ষিত আসন ও মহিলা আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি পরিবর্তনের চিত্রও চোখে পড়ে। 'মাটির অ্যান্টেনা' উপন্যাসে 'প্রভাত তরঙ্গে' ভাঙ্গি পরিবার ও টুনির কথাবার্তা বেশি গুরুত্ব পেলেও শেষ অবধি দেখা যায় 'মধ্যাহ্নের সংগীত' পর্যায়ে তহমিনা বিবির কথাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। এই তহমিনা বিবি ১ নং ভাসতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্য। কর্ণ মাধবপুর এই পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে। এই কর্ণ মাধবপুরে ঢুকে পড়েছে সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলাদলি ও চালচিত্র। কর্নায় তখন 'কাস্ট পরিবারের' কাউকে ভোটে প্রার্থী করার আলোচনা এবং চেষ্টা করা হচ্ছিলো। শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন জটিল আলোচনা যেমন—"দিবাকর শুনল রাতুল বোঝাচ্ছে...সেও লেখাপড়া জানা।"[৪] অপরদিকে ভাঙ্গি পরিবারের কর্ত্রী ক্ষান্ত এসব প্রস্তাবকে একদম গুরুত্ব দিতে নারাজ। বিভিন্ন টালবাহানার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত তহমিনাকেই প্রার্থী করা হয়। শেষে ভোটের মাধ্যমে জয়ী হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হয় তহমিনা। সে ভোটে জেতার পর গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের মধ্যেও নিয়ে আসে এক নতুন চেতনা ও নতুন ভাবে লড়াইয়ের মধ্যে বেঁচে থাকার প্রেরণা। লেখকের কথায়—"তহমিনাই প্রথম এ-অঞ্চলে চৈতন্যের স্তরে মৃদু নতুন হাওয়া নিয়ে হাজির হয়েছিল।"[৫] অর্থাৎ সে ভোটে জেতার পর প্রথম দিকের জড়তাটুকু কাটিয়ে উঠে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়। মানুষের প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে পাশে থেকে সে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করে। এমনকি বিধবা ভাতার টাকা প্রদানের তদারকি করার উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত প্রধান বিলায়েৎ আলীর অনুরোধে সে পোস্ট অফিসে এসেছে। পোস্ট অফিসে এসে তার প্রত্যক্ষ হয় যে পিওন কার্তিক বৈশ্য ইচ্ছাকৃত ভাবে উপস্থিত বিধবাদের হেনস্থা করে। প্রধানের অনুপস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে বিধবা ভাতা পাওয়া মহিলাদের ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা করে। কিন্তু তহমিনার হস্তক্ষেপে কার্তিকের স্বার্থে আঘাত লাগে। তাই বিভিন্নভাবে কার্তিক তহমিনাকে অবহেলা ও তাচ্ছিল্য করার চেষ্টা করে। এ

যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এক প্রতিচ্ছবি কার্তিকের মাধ্যমে দেখতে পায় তহমিনা। যদিও মহিলাদের এই লাঞ্ছিত ও অবহেলিত চিত্র শুধু আজ নয় বিগত কয়েক দশক ধরেও এর কোনো নিস্তার নেই। প্রশ্ন জাগে একজন মহিলা সদস্য হিসেবে রাজনীতির এই বৃহৎ পরিসরে আজকের তহমিনারাও কি একইভাবে পুরুষের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকবে? আলোচ্য উপন্যাস শুধু ঘরে বা বাইরে নয় রাজনীতির আঙিনাতেও মহিলাদের স্থান কতোটা অগ্রসর হয়েছে, সেই বিষয়টিকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন। কেননা এই ভাসতারা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় আট জন মহিলা সদস্য স্বভাবতই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে বিজয়ী হয়েছেন, তাই আর পাঁচজন পুরুষ সদস্যদের মতো তাদেরও ক্ষমতা ও স্বাধীনতা সমান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে তাদের বাঁধাপ্রাপ্ত হতে হচ্ছে সমাজের মধ্যে এবং তাদেরকে একঘরে করে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। শুধুমাত্র যে সমস্ত কাজে অর্থ নেই আছে কেবল ঝামেলা সেইসব জায়গায় মহিলা সদস্যদের চক্রান্ত করে ঠেলে দেওয়া হয়। যেমন—চক্রান্ত করে তহমিনাকে ঠেলে দেওয়া হয় পোস্ট অফিসে উটকো কাজের জন্য। পোস্ট অফিসে বিধবা ভাতার কার্য তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয় তাকে। পঞ্চায়েত প্রধান বিলায়েৎ আলীর অনুরোধে সে এ কাজ করে। অথচ পঞ্চায়েত প্রধান ও অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যরা নিজেরাই অনুপস্থিত থেকে যায়। অবস্থা এমনই যে পোস্ট অফিসের সামান্য ক্লার্কও তাকে উপেক্ষা করে। পাশাপাশি গ্রাম সভাতেও তহমিনা হেনস্তা হয়। পুরুষ নেতৃত্বরা আড়ালে চুপ করে বসে থাকে। এমনকি ১ নং ভাসতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যেরা সাক্ষাৎকার নিতে আসা সাংবাদিককে প্রীতিময় দত্ত সাক্ষাৎকার নিতে বাঁধাদান করেন। তিনি বলেন—"মেয়ে মানুষ। কী থেকে কী বলবে।"[৬] এরকম তাচ্ছিল্য পেতে পেতে তহমিনার বুঝতে অসুবিধা হয় না—"...আসলে মেয়েরা এখনও পুরুষের হাতের পুতুল।"[৭] এই সূত্রেই সে ভেবেছে—"যেন পঞ্চায়েতের মেম্বার হিসেবে তহমিনার কোনো গুরুত্ব নেই। উটকো এসেছে। সংসারে পুরুষরা যেমন মেয়েদের উপেক্ষা করে। কে মাধবপুরের মেম্বার জীবনকমল যখন আসে, এই কার্তিক কী বশংবদ হয়ে যায়! তাহলে কী মহিলা মেম্বার বলে? আর তখনই তহমিনার মধ্যে একটি জেদ ও আত্মসম্মানের দড়ি পাকিয়ে শক্ত হতে থাকে। গত পাঁচ বছরে প্রায়, এমনই সূক্ষ্ম অবহেলা এবং অপমানের মধ্যে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ও কিছু আলাদা কথা বললেই চাপ, বাঁধা কিংবা উপেক্ষা ডোকরা স্কিমটা বের করে আনতে কম মেহনত গেছে? তহমিনা জানে এখানে সাহায্যের ব্যাপারে কোনো দল-গোষ্ঠী

নেই। সব পুরুষ এককাট্টা।”[৮] উপন্যাসে লিঙ্গ রাজনীতির এই খেলাকে লেখক বহু ব্যাপ্ত পরিধিতে স্থাপন করেছেন।

এছাড়াও সংসদীয় রাজনীতির চর্চার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে, গ্রামের নন্দদুলালের প্রাচীন মন্দির নিয়ে পুরনো সেবাইত বংশের সলিল কৃষ্ণের সঙ্গে বর্তমান ট্রাস্টির মহারাজের দ্বন্দ্ব। সলিল কৃষ্ণ রাজনীতিতে গোঁজ হতে চাইছে। স্বার্থান্বেষী ও ধান্দাবাজি মানুষের উস্কানিমূলক কথার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অহেতুক বিরোধ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ পেলে তাদেরই আখের লাভ হয়, এমন রাজনীতিও চোখে পড়ে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে গ্রামীণ রাজনীতির প্রেক্ষাপট। গড়ে উঠছে শহরে সংস্কৃতি ও পরিবেশের আদলে নতুন আধুনিক গ্রাম্য পলিটিক্স। গ্রামীণ রাজনীতির এই পরিবর্তিত রূপ যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদের নতুন সমীকরণ মেনেই তৈরি হচ্ছে সেটাও বলা বাহুল্য। অতীত কালের সেই কর্ণ মাধবপুর গ্রামের সান্ধ্যকালীন আধিভৌতিক গ্রামের পরিবেশ বদলে গিয়ে ইলেকট্রিক আলো এসে গেছে। জনসংখ্যার দিক থেকেও দেখা যায় প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি। আকাশ বাতাস মাটি মেঘ নির্ভর প্রকৃতি অনুসারী সেই মান্ধাতার আমলের চাষবাস, বিলের মাছ ধরা জীবন-জীবিকার সেই প্রতিচ্ছবি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আধুনিকতার উত্তরণ ঘটেছে জলসেচ ব্যবস্থায়, হাইব্রিড বীজের উচ্চ ফলনশীল চাষবাসে। সেখানে দেখা যায় কংক্রিটের ব্রিজ, রিভার লিফট পাম্প ব্যবস্থা। এছাড়াও অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। পুঁজির আমদানি ও তার ব্যবহারের ক্ষেত্র বদলের ফলে গড়ে উঠেছে মনোহারী, রাতুলের এলোপ্যাথি ঔষধের দোকান। লগ্নি হচ্ছে সিমেন্টের ডিলার শিপে, I. S. D., S. T. D. বুথ বা নার্সিংহোমের জন্য। বাড়ছে যান্ত্রিক মপেট, মোটর সাইকেলে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ। সুতরাং এটা বোঝা যাচ্ছে, গ্রামীণ অর্থনীতির যে বুনিয়াদ তা দু-কড়িবালা ও বনমালী ভাঙ্গির সময়কালে যা কিছু ছিল বর্তমান তার পরিবর্তিত রূপ এখন দেখা যাচ্ছে। R. D. P. স্কিম, বিধবা ভাতা ইত্যাদি প্রকল্প চালু হয়েছে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক নয়া ইমারৎ দ্রুত গড়ে উঠেছে। উপন্যাসে পারিবারিক বিশ্লেষণেই উঠে এসেছে কর্ণ মাধবপুরের অতীত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিবর্তনের রূপরেখা।

অগ্নিদগ্ধ : ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের আলোচ্য 'অগ্নিদগ্ধ' উপন্যাসটি লেখা। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস, যা 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। সমকালীন অগ্নিগর্ভ ধর্মীয় সমাজ, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের চিত্র এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচ্য উপন্যাসটি বর্ণিত হয়েছে। ১৯৬৬ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুরু হয়েছিল খাদ্য আন্দোলন। লেখক নিজেও সেই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন যে তাঁর বোকে যাওয়া একজন মেধাবী ছাত্র, যে নাকি বয়ঃসন্ধিকালে ক্রমশ গেঁজিয়ে যাচ্ছিল জীবন শৈলীর পথভ্রষ্টতায়। এই বোকে যাওয়া ছাত্র এক সময় এই খাদ্য আন্দোলনে যুক্ত হয়। আচমকা এই আন্দোলনের আগুনে পুড়ে পরবর্তীকালে ছেলেটি নিজেকে শুধরে নেয়। লেখক এই জায়গা থেকে মনে করেন যে, একজন ব্যক্তি সে যদি প্রাথমিক ভাবে ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়, তবুও কিন্তু সমষ্টিগত আন্দোলনে যুক্ত হয়ে সে নিজেকে অগ্নিশুদ্ধি করতে পারে। এই নিয়েই 'অগ্নিদগ্ধ' উপন্যাস।

ইতিহাস ও সংস্কৃতিমূলক উপন্যাস

পানিহাটা : 'পানিহাটা' উপন্যাসটিতে কথা সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায় অতীতের এক সুপ্ত ইতিহাসকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। লেখক অতীত ও বর্তমানকে একসূত্রে গ্রথিত করে এক অসামান্যতা প্রদান করেছেন। আলোচ্য 'পানিহাটা' উপন্যাসটি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই অঞ্চলটি সর্বপ্রথমে ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের। সেখানে চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ আসার ফলে সেখানকার মানুষগুলোকে বৈষ্ণবধর্মে রূপান্তরিত করার একটা সংকল্প তৈরি হয়। কেননা, ওই অঞ্চলের সমস্ত মানুষ ইসলাম ধর্মে সাড়া দিয়ে ব্রাহ্মণ ধর্ম পরিবর্তন করার একটা ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছিলেন। কারণ তারা বিশ্বাস করেন, ইসলাম ধর্মের যে আহ্বান সেটা সর্বত্রই সমান এবং সেই ধর্মের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। এই ডাকে সাড়া দিয়ে পানিহাটা অঞ্চলের মানুষগুলো সংকীর্ণ ব্রাহ্মণ ধর্ম থেকে বেরিয়ে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। পানিহাটার জীবনে এতদিন থেকে কৃষ্ণ ভক্তরা যে ভাবে বাউল বাগদিদের চোখে ছোটো জাত এবং যারা গোপনে এতদিন ঘরের আড়ালে খোল-করতাল বাজিয়ে নাম গান করতো। আজ তারা প্রথম প্রকাশ্যে পথে নেমে কৃষ্ণ নামের জপ করে গেল। সে কালে পানিহাটার মধ্যে ছিল শাক্ত

ধর্মাবলম্বীরা এবং তাদের প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশি। এমনকি ছিল বর্ণ হিন্দু সমাজ। এছাড়াও ছিল অঘোরপন্থিদের দল। সেখানে দেখা যেত মুসলমান ধর্মের মানুষদেরও, যাদের ধর্মও দৃশ্যমান ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে শ্রীচৈতন্যদেব সবকিছু উপেক্ষা করে সকলকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। একদিকে ধর্মীয় ভাঙন এবং অন্যদিকে ইসলামের বিস্তার, এই দ্বৈত সত্ত্বাকে তিনি রুখে দিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব উদার মানসিকতা এবং আবেগ ঘন স্পর্শে। অতএব বহুমাত্রিক পরিবর্তনের এই বিন্যাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে পানিহাটায় শ্রীচৈতন্যের আগমন এক ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে করা যায়। সেদিন তাঁর নেতৃত্বে পানিহাটা দেখেছিল এক নবযুগের অধ্যায়কে। এই পানিহাটাতে এসে ইসলামদের বিজয়রথের চাকা থেমে গিয়েছিল। এই কৃতিত্বের পুরো দাবিদার শ্রীচৈতন্যদেব নিজেই। এমনকি পানিহাটার সকল শ্রেণির মানুষকে তাদের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি একসূত্রে গ্রথিত করতে পেরেছিলেন। অথচ আজ বর্তমান সময়ের এই পানিহাটা খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। অতীতের সেই স্মৃতিসৌধ ও মূল্যবোধ সবটাই ধুয়ে মুছে যেতে বসেছে। আজ তাই পানিহাটা যেন নতুন কারও আবির্ভাবের প্রতীক্ষারত। আর এই ব্রাহ্মণ ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার যে একটা প্রচেষ্টা সেটা বন্ধ করার জন্যই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। যা হিন্দু ধর্মের সংস্কৃতির একটা অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত। পানিহাটা নেহাতই একটি বঙ্গীয় জনপথ। তবে এক সময় এর একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ছিল। ছিল উজ্জ্বল ইতিহাস ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাসও কোনো অংশে কম নয়, বেশ ঋদ্ধ বলা যেতে পারে। চৈতন্যদেবের পানিহাটায় আগমন ও সেইসূত্রে পানিহাটার পাঁচশো বছরের ইতিহাস দধীচি গাঙ্গুলীর মনের অবচেতনে ফুটিয়ে তুলে একটি নিটোল কাহিনি বৃত্ত তৈরি করেছেন লেখক। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে লিখিত 'পানিহাটা' উপন্যাস শুরু হয়েছে দধীচি গাঙ্গুলীর ইজি চেয়ারে বিশ্রাম নেওয়ার মধ্য দিয়ে। তিনি এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। Flash Back পদ্ধতিতে বারে বারে তিনি ফিরে গেছেন অতীত স্মৃতিচারণায়। মফস্সল পানিহাটার ছায়ার ঘোমটা খুলে নগর হয়ে ওঠার কাহিনি এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। সামনে ঝোলানো ক্যালেন্ডার দেখে দধীচি গাঙ্গুলীর মনে পড়ে পাঁচশো বছর আগে ঐ তারিখে কিছু পরিষদ নিয়ে মহাপ্রভু বজরা থেকে পানিহাটায় অবতরণ করেছিলেন। টেলিফোনের আওয়াজে দধীচি গাঙ্গুলী বাস্তবে ফিরে আসেন এবং রামপ্রসাদের মাধ্যমে তার দাদা জ্যোতিপ্রসাদের মৃত্যুর সংবাদ শোনেন।

রিটায়ার অধ্যাপক সদ্য পরলোকগত জ্যোতি প্রসাদ ছিলেন তাঁর ছোটোবেলার আইডল। কেননা সে ছিল অত্যন্ত মেধাবী এবং স্কুলের গর্ব। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে স্বাভাবিকভাবেই দধীচি কখনো ডুব দেন স্মৃতির কুয়াশার গভীরে, কখনো প্রস্থান করেন এই পানিহাটার ইতিহাসের উৎসে। যেমন—

> "গজত্ব হারিয়ে পানিহাটা সবে মফস্‌সলের মালিন্য ঘুচিয়ে একটু একটু আড়মোড়া ভাঙছে। নদীর তীরে একটি ছায়াচ্ছন্ন বিশাল ঐতিহাসিক শ্যাওলা ধরা শ্বেতপাথরের ফলক দেখিয়েছিলেন। বার্ধক্যে দধীচি বহুবার এ ঘাটে পা রেখে লক্ষ করেছেন, শ্যাওলার আড়ালে কালো অক্ষরের খোদাই উঠে গেলেও বোঝা যায় লেখা আছে—এই সেই ঘাট, নীলাচল হতে ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের তিথিতে বুধবার চৈতন্য মহাপ্রভু অবতরণ করেছিলেন।"[৯]

অর্থাৎ তাঁর মনে পড়ে পাঁচশো বছর আগে একই দিনে ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে কি এক গোপন অস্থির টানে রামকেলির উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেব হাজির হয়েছিলেন গঙ্গাতীরস্থ বট বৃক্ষের তলায়, যেখানে পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণদেবও এসেছিলেন। মাত্র দেড় মিনিটের মতো ফোনে কথা বলার প্রসঙ্গে তিনি হারিয়ে যেতে থাকেন বিস্মৃতির অতলে। এ জন্যেই বোধহয় বলা হয় পৃথিবীতে আলোর চেয়েও দ্রুতগামী মানুষের মন। ফোনে কথা হতে হতেই তাঁর মন পাঁচশো বছর আগে ও পরের অতীত বর্তমানে ঘোরাফেরা করে। তাঁর স্মৃতিচারণায় স্বভাবতই উঠে এসেছে চৈতন্যদেবের বিভিন্ন প্রসঙ্গ। অতীত বনাম বর্তমানের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব নতুন রূপে নতুন আঙ্গিকে উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি সমাজ জীবনের বিভিন্ন প্রান্তকে ছুঁয়ে গেছেন। লেখকের ভাষায়—উল্কা ছাই হয়ে গেলে উল্কা থাকে না—পাথরে পরিণত হয় যেমন, মফস্‌সল তাপাঙ্ক ছাড়িয়ে শহর হলে আর মফস্‌-সলের চরিত্রে ফিরতে পারে না। অর্থাৎ বাঙালির সমাজ জীবনের বিভিন্ন পরিবর্তন ঔপন্যাসিকের তীব্র পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে।

পানিহাটায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আগমন, আদ্বিজ চণ্ডাল ও বৌদ্ধদের আলিঙ্গন ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য। সেই সত্যের গভীরে ডুব দিয়েছে দধীচির মন, মনন। তারপর আবারও ফিরে আসেন বাস্তবের মাটিতে। পরবর্তীতে জ্যোতিপ্রসাদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে স্মৃতিচারণা। সেই সূত্রে বাঙালির এই যে ভাঙাগড়ার সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস সেটাও

আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এরপর সেই ইতিহাস ও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক ভাবে পানিহাটার পরিবর্তনের চিত্র দেখা যায়। সেই সঙ্গে ক্যাপিটালিজম ডেভেলপের একটি লক্ষণ দেখা যায়। রামপ্রসাদের কথা অনুযায়ী বলা যেতে পারে—

> ‘‘পাঁচশো বছর পর, বুধবারেই, রামপ্রসাদ যখন ফোন করছিল—অজ গ্রাম আর নেই সাড়ে চার লক্ষের একটি শহর, ৩৫টি ওয়ার্ডের মিউনিসিপ্যালিটি—নিকট আগামীতেই সরকার নোটিফিকেশন করে কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করবে। শহর থেকে নগরীর মর্যাদা।’’[১০]

পানিহাটার সংস্কৃতিগত পরিবর্তন যে কতোটা হয়েছে সেটাও দধীচি উপলব্ধি করেন এভাবে—

> ‘‘আজকাল পথে ঘাটে ‘ব’ কারান্ত ‘চ’ কারান্ত শুনতে শুনতে ভাষাবিকৃতিটা গা-সওয়া। এমনকি টিভি-থিয়েটার, রাজনৈতিক নেতাদের মুখে ভাষার আড়াল যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। ওই শব্দটি সে যুগে বয়ঃসন্ধির বন্ধুরা নির্জনে, নিজেদের মধ্যে, মাঠঘাট, খেলাধুলোর বৃত্তে উচ্চারণে সাহস পেত না।’’[১১]

এমনকি এই পরিবর্তনের রূপরেখা এসেছে জনসংখ্যার ঘনত্বের বিন্যাসেও। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র নগর অঞ্চলের যে ছবি তা পানিহাটাতেও লক্ষ করা যায়। দধীচি মনে করেন এত মানুষ চারিদিক থেকে যেন স্রোতের মতো করে মিশে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই চাপে হয়তো কোনো একদিন জনবিস্ফোরণ ঘটে যাবে পানিহাটাতে। এছাড়াও সেখানে জনবসতিগুলি নানা ব্যবধানে চিহ্নিত, সে যেমন—

> ‘‘ভট্টাচার্য পাড়া, বাঁড়ুজ্জে পাড়া, ঘোষ পাড়া, তেত্তর পাড়া, ময়রা পাড়া, তিলি পাড়া নিজির পাড়া—কতো কী! ...আর এখানের অঞ্চলগুলো জাতীয়তাবাদের ঔজ্জ্বল্যে, দেশবন্ধু, সুভাষ, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল চন্দ্র, বরিশাল, ফরিদপুরের নামে চিহ্নিত হয়ে উঠেছে।’’[১২]

আসলে সাধন চট্টোপাধ্যায় যে সময় লেখালেখি শুরু করেছিলেন তখন পৃথিবীও তার প্রেক্ষিত সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেছে। বিশ্বায়নের পৃথিবী তখন। বিশ্ব গ্রাম গড়ে তোলার নামে শুরু হয়েছে উপনিবেশবাদের নয়া অধ্যায়। ক্ষমতাবানের থাবা দুর্বলতর জাতির কালচারকে, তার ভাষাকে,

ঐতিহ্যকে গ্রাস করতে, অবলুপ্ত করতে উদ্যত হয়েছে। এই আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়ে তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছিল সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের পালা। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'পানিহাটা' উপন্যাস তাই রসসাহিত্য মাত্র নয়—এই সন্দর্ভ আসলে নয়া উপনিবেশবাদ প্রতিরোধে প্রতিরোধেরই এক শিল্পিত বয়ান। শিকড় ভোলার যুগে দাঁড়িয়ে স্রোতের বিপরীতে গিয়ে তিনি অতীতমুখী হয়েছেন। তুলে এনেছেন পানিহাটার বিস্মৃত সমৃদ্ধশালী ইতিহাস।

এই উপন্যাসের সবথেকে উল্লেখযোগ্য চরিত্র দধীচি। তিনি ছিলেন রেলের নামকরা ইঞ্জিনিয়ার। সারাজীবন রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে গিয়ে জীবনকে উপভোগ করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আর এটা যখন তিনি উপলব্ধি করতে পারেন তখন জীবনের ক্যানভাসের রং বদলে যায়, সবুজ পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়। আসলে আধুনিকতার সবকিছুই তো আর খারাপ নয়। যা কিছু ভালো তাকে গ্রহণ করা উচিত। রুচির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের মেলবন্ধন না ঘটতেই পারে কিন্তু তাতে রসের হানি অন্তত ঘটে না—'জীবনের বিচিত্র দাবির সবকিছুকেই কল্পিত জীবনদর্শন দেখিয়ে ছেঁটে ফেলার কোনো মানে হয় না।' আত্মমুখীনতা মানুষকে একাকীত্বের সম্মুখীন করে তুললেও বহির্মুখী মানুষের অস্তিত্বের সংকটে সে ভোগে না। কিন্তু রক্তের মধ্যে এক ধরনের বিপন্নতা কাজ করতে থাকে। সবশেষে দধীচি গাঙ্গুলীর যৌথ পরিবারে ভাঙনের চিত্র দেখা যায়। সংসারের ঘড়িও যেন ব্যাটারির অভাবে বন্ধ হয়ে যেতে বসে। দেবলদের বড়ো মামা পরমেশবাবুর মৃত্যু হলে শ্মশানে গিয়ে মৃত্যুর বৈরাগ্য ও চৈতন্যদেবের কীর্তন শুরুর মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়। জীবনকে অস্বীকার করে নয়, স্বীকার করেই সাধন চট্টোপাধ্যায় 'পানিহাটা'-র বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন। তার মাঝে স্থাপন করেছেন দধীচির জীবনপ্রবাহ ও অতীত চারণার স্মৃতি। চৈতন্যদেবকে উপাদান রূপে গ্রহণ করে উপন্যাস রচনা বাংলা সাহিত্যে স্বল্প মাত্রায় হয়েছে। সেদিক থেকে ঔপন্যাসিক চৈতন্যদেবের সঙ্গে পানিহাটার পাঁচশো বছরের ইতিহাসকে অপূর্ব মুনশিয়ানার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে বিশিষ্টভাব দৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। মননশীল এই উপন্যাস সাহিত্যের সর্বস্তরের পাঠকের হৃদয় ছুঁয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে' উপন্যাসটিতে নির্মিত হয়েছে বর্তমান সময়ের জাগানো সংবাদ কঙ্কাল উদ্ধার, তজ্জনিত রাজনৈতিক প্রচার ও তার

প্রেক্ষাপট। এই প্রেক্ষাপটের হাত ধরে লেখক তাঁর যাত্রা শুরু করেছেন বিদেশি পুঁজিবাদীদের আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে আগমন ও শোষণ, এছাড়া নীলকর অত্যাচার এবং আরও কিছুদিন পর স্বাধীনতা আন্দোলনের একেবারে শেষ পর্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ এর মরণজয়ী সংগ্রাম, পরাজয়, গ্রেপ্তার, বিচার এবং পরবর্তীকালে তাদের গুপ্তহত্যার রক্তভেজা পথে। এ প্রসঙ্গে কথাকার স্বয়ং জানিয়েছেন—

> "স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায় নীলগঞ্জের সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে I. N. A. সেনাদের গুপ্তহত্যার পরে গোপনে কবরস্থ করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দানবীয় ক্ষমতার প্রবাহ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে N. G. O., গণমাধ্যম, রাজনৈতিক দল ইত্যাদিকে আশ্রয় করে অন্তঃসলিলা ফণা ধারার ন্যায় কীভাবে নতুন ভাবে মাথা তুলল, বিস্তার করলো তার শোষণ জাল আলোচ্য উপন্যাসের পরোতে পরোতে এরই গ্রন্থিমোচন করা হয়েছে।"[১৩]

লেখকের এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় আসলে তিনি সচেতনভাবেই আলোচ্য উপন্যাসে ক্ষমতারকেন্দ্রটিকে ধরতে চেয়েছেন।

আলোচ্য উপন্যাসে 'বুলবুলি' বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা বৈদেশিক, বিভিন্ন সময়ে আমাদের দেশে এসে আমাদের গচ্ছিত সম্পদকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বা যারা ভারতবর্ষের ধন-সম্পদকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই সব বিদেশি পুঁজিবাদীদের 'বুলবুলি' নামে আখ্যা দেওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—নীল আন্দোলনের সময় আমাদের চাষিদের জোরজবরদস্তি নীল আন্দোলনে যুক্ত করিয়েছে। নীল আন্দোলন করার ফলে সেখান থেকে এই বুলবুলিরা বৃহৎ মুনাফার ফায়দা তোলার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে সেই অর্থ হরণ করে নিয়ে চলে যায়। এরপর দেখা যাবে স্বাধীনতার পরবর্তীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের I. N. A. সৈনিকরা যারা এক সময় চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে একটা স্বাধীন জায়গায় নিয়ে আসতে এবং সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা বলবত করতে—সেই আজাদ হিন্দ ফৌজের এই স্বপ্নের I. N. A. সেনাদের গুপ্ত হত্যা করা হয় নীলগঞ্জের সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে। অর্থাৎ এই বুলবুলিরা শুধু আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরেই আঘাত হেনে আধিপত্য বিস্তার

করেননি, তারা আমাদের দেশের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক দিকের উপরও যথেষ্ট প্রভাব ফেলে এবং আধিপত্য বিস্তার করার একটা প্রবল চেষ্টা তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

লক্ষ করলে দেখা যাবে স্বাধীনতার পরেও ক্ষমতার এই মূলকেন্দ্র অক্ষত থাকলো। এই সময়ের নতুন বুলবুলিরা হচ্ছে N. G. O., রাজনৈতিক ক্ষমতাশীল দল, গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, যারা বিভিন্ন ভাবে দেশের মধ্যে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করে থাকেন। অতএব আজও যারা বিদেশ থেকে এদেশে আসে তাদের সম্বন্ধে আমাদের দেশের সাধারণ নাগরিকগণ এখনো সন্দিহান। তারা কীভাবে ভারতীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে এটাই আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।

সাতপুরুষ ডট্ কম : সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সাতপুরুষ ডট্ কম' উপন্যাসটিতে নব প্রজন্মের উন্নয়নের যে ধারাবাহিক মূল্যবোধহীন অগ্রগতি, সেই অগ্রগতিকেই আখ্যানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর পরবর্তীকালেও কিন্তু পুঁজিবাদের ভালো দিকগুলির বিকাশ আজও রয়েছে উপেক্ষিত। উল্টে উন্নয়নকে হাতিয়ার করার নামে সমাজে চলে আসে উৎকট এক সংস্কৃতি। আর এই সংস্কৃতির প্রবণতা বা বাতাবরণ আজও বহমান। কোনো এক সময় রেলপথ বসানোর হাত ধরে যে কর্পোরেট সংস্কৃতির বা কর্পোরেট কালচারের শুভ সূচনা হয়েছিল সেই কর্পোরেট কালচারের বিকাশ এখন গগনস্পর্শী। সবকিছুর বিনিময়ে আর্থিক দিক থেকে সচ্ছলতা বা অর্থ রোজগার করাই এখন মানুষের প্রধান লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই প্রবণতা লক্ষ করা যায় এক প্রজন্মের পর আর এক প্রজন্মের মধ্যে। লেখকের 'সাতপুরুষ ডট্ কম' উপন্যাসটির সূচনা হয়েছে বড়লাটের রেলপথ নির্মাণের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে। লেখকের ভাষায় বলতে গেলে—

> "বড়লাটের হুকুমে রেললাইন পাতবার সার্ভের খবর পেতেই নৃসিংহ রায় নিজের মাথায় বুদ্ধি খাটিয়ে এক গ্রহ বিপ্রকে ডাকিয়ে আনলেন। জমিদার বাড়িতে পঞ্জিকা ও তিথি নক্ষত্রের গণনা ছাড়া কোনো কাজের সূচনা হয় না। বাড়ির সমস্ত ত্রয়ো ও কুমারীরা নিয়মিত সাবিত্রী, কার্তিক কিংবা নানা ষষ্ঠী ব্রত পালন করে।"[১৪]

উপন্যাসটিতে আমরা দুটি খণ্ড আখ্যান দেখতে পাই, একটি হলো জাদু বাস্তবতার আখ্যান আর অন্য আখ্যানটির অবস্থান বাস্তবের ভূমিতে। প্রথম পরিচ্ছেদের ঘটনা বৃত্ত সম্পূর্ণভাবেই জাদু বাস্তবধর্মীকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। রেলপথ বসানোর মতো যে মহৎ কাজ সেটার আড়ালে ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার চূড়ান্ত প্রয়াস লক্ষ করা যায়। যা নৃসিংহ রায় ও নলিনী কুমার দুই ভাইকে বাইনারি অপজিশন হিসেবে চিহ্নিত করলেও পরবর্তীকালে কিন্তু শ্রেণিগত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে তারা কোনোভাবেই বাইনারি অপজিশন বা দ্বৈত বিরোধী বলে মনে হয় না। বরং আমরা সিনারি অফ সিমিলার স্ট্যাটাস বলতে পারি। এই দুই জনের মধ্যে জমিদারি নিয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যেমন আছে, তেমনই আবার সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতাও এই উপন্যাসে অতীত ইতিহাসের বাস্তবতা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছে। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসনকাল, সমাজ সংস্কারক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন দিকগুলি লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় নিখুঁত ভাবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে যেমন দুজনই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সন্তান ও জমিদারি ব্যবস্থার ধারক, তেমনই আবার দুজনেরই জমিদারিও আছে। এজন্যই তারা গ্রামে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু সংস্কৃতি বা কালচারের দিক থেকে দুজন বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। নৃসিংহ সংস্কৃতিগত দিক থেকে রক্ষণশীল ও পশ্চাৎপদ। যা কিছু প্রবহমান প্রথা, সংস্কৃতি তিনি তার সমর্থক। অন্যদিকে নলিনী কুমার স্বভাবে প্রগতিশীল, সংস্কারপন্থি, বুদ্ধিমান এবং উদার। কেননা বিদ্যাসাগর তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠার আবেদন জানালে তিনি এককথায় সম্মতি প্রদান করেছিলেন। নিজের এলাকায় পয়সা খরচ করে বিদ্যালয় স্থাপন করার সংকল্প করেছিলেন। বিধবা বিবাহেও উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এছাড়া সতীদাহ প্রথার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। নীলকুঠির একজন সাহেব সতী উদ্ধার করলে তার বিরুদ্ধে সমাজপতিরা ক্রুদ্ধ হলে তিনি সেই সমাজপতিদের রক্তচক্ষুকে নস্যাৎ করে সেই সাহেবের পাশে থাকেন। প্রথম পরিচ্ছেদে জাদুবাস্তবতার পরিবেশ থাকলেও সেখানে প্রবলভাবে অতীত চরিতার্থ ঢং লক্ষ করা যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেভাবে একজন লেখক তার অতীত তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ তুলে ধরেন বর্তমান সময়ের আদলে এখানে কিন্তু সেরকম ভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাস বা ঐতিহাসিক রোমান্সের সেই আদলটি গড়ে ওঠেনি। অতীতের নলিনী কুমার পাঁচ মুড়ো থেকে ট্রেন যাত্রার সওয়ারী হতে নিজস্ব ঘোড়া হৈমিকে নিয়ে যাত্রা করেছেন। শশধরের আগরপাড়ার বাড়িতে উপস্থিত

হয়েছেন এবং আসতে সময় লেগেছে তিন প্রহর দু-দণ্ড। কথকের কথন থেকে জানা যায় নলিনী কুমার শশধরের ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ। অতীতের মানুষের বর্তমানের পটভূমিতে এই আগমনের কথায় বাস্তব এবং ফ্যান্টাসির জগতের সংমিশ্রণ ঘটে যায়। এরফলে সৃষ্টি হয় জাদু বাস্তবতার স্বপ্নিল পরিবেশ। শশধরের তাকানোর অনুভূতি থেকে বলা যায়—

> "জীবনের শেষ বেলায় আগরপাড়ার সব কিছু বদলাবার এমন খৈ-হরিবোল অনুভব করেনি। যার যা পুরনো বসত, শ্বাস-প্রশ্বাসের জমি, ভেঙে ফাটিয়ে ফ্ল্যাট। অলিগলি রাস্তা এমন চেপে গেছে সারা বছর নর্দমার জল সরে না। একটু ভাবি পশলা ঝরলেই, হাঁটুর ওপর প্যান্ট গুটিয়ে আবর্জনার জলে পা খ্যাপলাতে হয়।"[১৫]

অর্থাৎ আগরপাড়ার এই পরিবর্তিত রূপে সবুজের চিহ্নটুকু মুছে যেতে বসেছে। গড়ে উঠেছে বহুতলের ফ্ল্যাট। আর একালের আগরপাড়ায় সাতপুরুষের সময়ের ব্যবধান ঠেলে ঘোড়ার পিঠে এসেছেন নলিনী কুমার। শশধরকে অবাক করিয়ে তিনি অকপটে তার আত্মপরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেন—

> "একি কোনো মায়া জাদুর জগত? ঐ ভুতুড়ে বুড়োটা শশধরের সব কিছু ওলটপালট করে দিয়েছে। অথচ কাউকে ডেকে এনে যাচাই করাও যাচ্ছে না। নিজেকে বলেছেন ঊর্ধ্বতন সাতপুরুষ।"[১৬]

এরপর দেখা যায় নলিনী কুমার ও শশধর একসঙ্গে নৌকা যাত্রা করেন। সেই যাত্রা কিন্তু বর্তমান থেকে অতীতের দিকে যাত্রা। এর দ্বারা সময়ের দ্বান্দ্বিক সুবিন্যাস লক্ষ করা যায়। নলিনী কুমারের যাত্রা যেমন—বর্তমান থেকে বর্তমানের দিকে কিন্তু অন্যদিকে শশধরের কাছে সেই বর্তমানকে বহু দূরের অতীত বলে মনে হয়। মাঝখানে শুধু সাতপুরুষের ব্যবধান।

অতএব নলিনী কুমারের সঙ্গে তাঁর যাত্রা হলো বর্তমানের উজান ঠেলে সময়ের কৃত্রিম কৌশলে চড়ে অতীত যাত্রা। এভাবেই আলোচ্য উপন্যাসে বর্তমান এবং অতীত একসূত্রে গ্রথিত হয়। রেল যাত্রী শশধরের মনে হয় জগত যেন ইতিহাসকে বদলে দিয়ে এমনভাবে পুরনো সব

সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন যুগে ঢুকেছে তা ভাবনার অতীত। লেখক মনে করেন, যা কিছু বর্তমান তার পেছনে আছে 'Continuity of Time' এই সময় চেতনাই উপন্যাসটির মৌলিকত্ব।

জীবন-জীবিকা ও সমাজ-জীবনমূলক উপন্যাস

গহিন গাঙ : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' (১৯৭৯ খ্রি:) উপন্যাসটি 'প্রান্তিক' পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক সুন্দরবন অঞ্চলের মালোদের জনজীবন, জীবিকা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে খুব কাছ থেকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেজন্যই হয়তো এই উপন্যাসে দেখা যায় জেলে মাঝিদের উপর বহমান অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তেমনই অসংগঠিত হওয়ার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টাও আমরা দেখতে পাই। লেখক এই উপন্যাসে জেলেদের এক কঠোর জীবন সংগ্রামের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসটিতে দেখা যায় কলকাতাগামী একদল যুবকের যেমন ব্যর্থ আত্মত্যাগ, তেমনই মধ্যবিত্ত মানুষের দোদুল্যমান অবস্থারও এক চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। এছাড়াও মহাজন, আইন রক্ষক ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের সমবেত ও সংগঠিত ভাবে যে শোষণ এবং মালোপাড়ার জেলেদের জীবন বিপন্নের এক অসহায় অবস্থার জীবনচিত্র লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে।

লেখক এখানে দেখিয়েছেন যে জীবিকার তাড়নায় মানুষ শিকার করতে গিয়ে কীভাবে নিজেরাই নির্মমভাবে শিকার হয়েছেন। তাদের করুণ পরিস্থিতির ছবি তুলে ধরেছেন এভাবে—

> ''বেঁচে থাকার এই একটি-কৌশলই জন্ম থেকে শিখতে হয়। কবে থেকে কেউ জানে না। পৃথিবীর বুকে নদী-সমুদ্রের কূল ধরে ধরে ছুটে বেড়ায় জীবিকার সন্ধানে। গাঙে মাছ ফুরিয়ে গেলে, তারা নতুন আস্তানা গড়ে। এখানেও দিনে-দিনে মাছ যত অপ্রতুল হয়ে উঠছে, বাড়ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিন-জালে এই বেতনা হাঁসফাঁস করে। তখন আশঙ্কায় মালোরা ছুটে চলে গাঙ বেয়ে আরও দক্ষিণে, ওই মোহনার খাড়ি, জঙ্গলের দিকে। জীবনের মায়া-মমতা, মৃত্যুর আশঙ্কা করার সময় পায় না। চোখগুলো স্থির, নোনাজলের বুক বেয়ে শিকারির মতো নেমে যায় খাড়িতে, অরণ্যের কোলে।''[১৭]

উপন্যাসটির আখ্যান যেহেতু বিন্যস্ত হয়েছে সুন্দরবনের গ্রাম জীবনের পটভূমিতে, সেসময় সুন্দরবনে জীবিকা অর্জনের যে চাহিদা সেটা মোটেও স্বচ্ছন্দের উপযোগী ছিল না। অধিকাংশ মানুষই নিজেদের জীবন বিপন্ন করে মধু সংগ্রহ করে ও মাছ ধরে। কুমির ও দক্ষিণ রায়ের অনুচরদের আতঙ্ক এদের নিত্যদিনের সঙ্গী। কখন কে বাঘের পেটে যাবে কেউ বলতে পারে না। এর সঙ্গে রয়েছে ওতপ্রোতভাবে মহাজনী ঋণের বোঝা। এই ঋণের জাল থেকে মুক্তির প্রয়াস করলেও পরিশেষে সেটা সম্ভব হয় না। তাদের মধ্যে ক্ষোভ বিদ্রোহ দানা বাঁধলেও এই অন্নহীন অসহায় মানুষগুলি শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হন। কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকেন্দ্রের উপ-ক্ষমতাকেন্দ্র, পুলিশ-প্রশাসন সবাই একযোগে অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যান। এর ফলে সমস্ত রকম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ শেষ হয়ে যায়। চলতে থাকে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণের পালা যা আলোচ্য উপন্যাসের বৈচিত্র্যে চিরন্তন বাস্তবতায় উঠে এসেছে।

'গহিন গাঙ' নামটির মধ্যে থেকেই আমরা জানতে পারি এটি একটি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে নদীটির নাম ছিল বেতনা। মালোদের জীবনযাত্রার মতোই বেতনার স্রোত শান্ত ও নিস্তরঙ্গ। উপন্যাসে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল ললিত ও তার পুত্র শ্রীপদ, হারান। সুন্দরবন অঞ্চলে মাছ ধরতে গিয়ে জেলেদের বাঘের পেটে যেতে হয় এটা নিত্যদিনের ঘটনা। ঠিক একইভাবে ললিত মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের পেটে চলে যায়। আর এই শোক সংবাদ শ্রীপদ বহন করে নিয়ে আসে মালোপাড়ায়। কিন্তু যেহেতু লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রথম থেকেই জীবন চেতনা বা বোধে একেবারেই ব্যতিক্রমী ছিলেন, তাই অনুরূপভাবে এখানেও বহমান স্রোতের বিরুদ্ধ পথযাত্রী। লেখক এই ব্যক্তি মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের আখ্যানকে বিন্যাস করলেন এক বৃহত্তর ক্যানভাসে। এর সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষমতাকেন্দ্রের বিভিন্ন রূপ এবং তাদের শোষণের বেড়াজালে কীভাবে নিঃস্ব হয়ে যায় মালোপাড়ার জেলেদের জীবনযাত্রা। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক তারই বাস্তব ও করুণ চিত্র এঁকেছেন। এই জীবন যন্ত্রণার কথা আরও বেশি করে স্পর্শ হবে উপন্যাসের ব্যবসায়ী চরিত্র আবদুল মহাজনের ফন্দি-ফিকির সুদের বেড়াজালে। আবদুল মহাজন মালোদের মাছ ধরার জন্য আগাম দাদন হিসেবে টাকা ধার দেন। কিন্তু তার পরিবর্তে মালোরা কম দামে বা কখনো কখনো নিজেদের লোকসানে তার কাছে মাছ বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সুন্দরবনের মালোদের জীবন-জীবিকা কার্যত সম্পূর্ণটাই

তার হাতে নির্ভর করে। মালোদের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এতটাই ব্যাপক যে শ্রীপদ পিতাকে হারানোর শোক পর্যন্ত ভুলে যায় এবং শোক চেপে ধরে মাছ নিয়ে আবদুলের কাছে পৌঁছানোর জন্য সদা ব্যস্ত হয়। আবদুলের মতো হাজার হাজার মহাজন সাধারণ মানুষ তথা জেলেদের জীবন-জীবিকা অর্জন করার জন্য যেভাবে দমিয়ে রেখে বিভিন্ন ছলচাতুরী করে ব্যাপক মুনাফা অর্জন করার চেষ্টা করেন সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার সাক্ষী লেখক নিজেই। তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে–

> ‘‘আবদুলের তর্জন-গর্জন এবং ঘাটবাবুর ফুট কাটার মধ্যে একটা গভীর অর্থ অঙ্গীভূত। এক অন্তরাল স্বার্থের যোগসূত্র তৈরি হয়ে আছে। ওই সুতোর টানেই যেকোনো মূল্যে মাছ বেচতে বাধ্য হয় মালোরা।’’[১৮]

অর্থাৎ আবদুল ও খাটবাবুর অন্তরাল স্বার্থের যোগসূত্রের কারণে যেকোনো মূল্যেই মাছ বেচতে বাধ্য হতে হয় মালোদের। এহেন ষড়যন্ত্রের কাছে ললিত আত্মসমর্পণ করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছিল। অন্যদিকে পিতার মৃত্যুর পর শ্রীপদ সর্বপ্রথম এই রকম শোষণের বিরুদ্ধে অর্থাৎ দুর্বোধ্য জাল থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে সচেতন ভাবে এবং দয়ালের উদ্দেশ্যে বলে–

> ‘‘না জ্যাঠা, জঙ্গলে আমি যাব না। বেতনায় বিন-জালে যা উঠবে, কো-অপারেটিপে বেচলে টাকা বেশি আসে। ...নৌকো আর জালের টাকা আবদুলকে তা দিয়েই শুধব।’’[১৯]

এর থেকে বোঝা যায় ক্ষমতার যে পেশী আস্ফালন তার বিরুদ্ধে জাগ্রত হয় এই শ্রীপদ। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটি সংঘবদ্ধ প্রয়াস লক্ষ করা যায়। শ্রীপদর এই প্রতিবাদের স্বর পূর্বেই জেগে উঠেছিল বেতনার তীরে। বর্তমানে পিতার অকাল মৃত্যুর কারণে আরও দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেখা যায়। লগ্নিপুঁজির ক্ষমতার যে মূল কেন্দ্র সেটাকেও ভেঙে ফেলার একটি প্রচেষ্টা করেন। এর ফলে গড়ে উঠেছিল Co-Operative। জেলেদের Co-Operative। এর মূল উৎসাহ দাতা ছিলেন একজন আদর্শবাদী ডাক্তার। যদিও এই ভূপতি বর্মনের নামে বিতর্ক তৈরি হয়। এই ভূপতি ডাক্তার নাকি স্বদেশী ডাকাত ইংরেজ আমলের লোকজন তাই মনে করতো। পরবর্তীকালে কারও কথায় ইনি পুলিশের লোকজন, কারও মতে তিনি নাকি রাজনৈতিক দলের

কর্মী, আবার কারও মতে তিনি ধর্মপ্রচারক। তবে আর যাইহোক মাছমারাদের নিয়ে Co-Operative তৈরি তারই কৃতিত্ব। নির্মমভাবে নির্যাতিত এই জেলেদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদের আগুনের শিখা প্রজ্বলিত করেছেন। অবশেষে বিভিন্ন টালবাহানার মধ্যে থেকে মালোরা এই Co-Operative পরিত্যাগ করে। সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনও ভেঙে যায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত শ্রীপদ Co-Operative এ দলবল নিয়ে পুনরায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেও নতুন করে আবার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় এবং প্রতিবাদের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। অর্থাৎ 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে সাধন চট্টোপাধ্যায় নেমে এসেছেন সুন্দরবনের প্রান্তিক জনজীবনের মধ্যে। এই সেই অঞ্চল যেখানে বাঘ ও কুমিরকে সঙ্গে নিয়েই মানুষের নিত্য দিনের পথ চলা। মধু সংগ্রহ, মাছ ধরা এই অঞ্চলের প্রধান জীবিকা। আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এদের জীবনকে ওষ্ঠাগত করে রেখেছে মহাজনী ঋণের দুর্বোধ্য জাল। এর থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যে জেগে ওঠে না এমন নয়। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসন, রাজনৈতিক দল সবই এই অর্থনৈতিক শক্তির সাহায্যকারীর ভূমিকায়, এদের সঙ্গে সঙ্গে মহাজনী শক্তিও এক রহস্যময় সম্পর্ক সূত্রে বাঁধা। ফলে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ অঙ্কুরেই গুঁড়িয়ে যায়। বারংবার রচিত হয় নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের এক বিবর্ণ ইতিহাস। 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে সাধন চট্টোপাধ্যায় এই চির চেনা বাস্তবতায় উন্মোচিত করেছেন শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে। তবে আলোচ্য উপন্যাসে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের যে অভিমুখ তা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রান্তেও প্রসারিত হয়।

পিতৃভূমি : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'পিতৃভূমি' (১৯৮৫) উপন্যাসটির স্থানীয় প্রেক্ষাপট সুদূর পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঝাড়খণ্ডের হাতিটিলা পর্যন্ত বিস্তৃত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো এক অবাঙালি হিন্দিভাষী নিম্নবর্গের যুবক মতিয়া। তার জীবনযুদ্ধ, দাম্পত্য জীবনের সকরুণ চিত্র এবং সবশেষে পিতৃভূমির প্রতি তার যে আবেগ ও টান এবং তা থেকে বদলে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি লেখক আলোচ্য উপন্যাসে পরিবেশিত করেছেন। উপন্যাসের প্রথম দিকে লেখক মতিয়া এবং তার জ্ঞাতি ভ্রাতা সুরুকে একে অপরের বিরুদ্ধ চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন। এই দুই চরিত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে আখ্যানের গতি এগিয়েছে। মতিয়া তার দারিদ্র্য বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে সুখে থাকার চেষ্টা করলেও পরবর্তীকালে সুরুর আবির্ভাব তাকে বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। যদিও

মতিয়া এবং সুরু দুজনই জীবন-জীবিকার তাগিদে পশ্চিমবঙ্গে পদার্পণ করেন। পরবর্তীকালে মতিয়ার অনুপস্থিতিতে সুরু যেভাবে লক্ষ্মীর হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে তা একটি জটিল সম্পর্কের আকার ধারণ করে। শেষে সুরু এবং লক্ষ্মী দুজনেই চলে নতুন জীবনের সন্ধানে। এরপর দেখা যায় লক্ষ্মীর সংসার জীবন ত্যাগের ফলে মতিয়ার আয় কমে যায়। কারণ পূর্বে দুজনের আয়ের মাত্রা দিয়ে কোনোরকম পেট চলতো কিন্তু এখন মতিয়ার একার আয়ে পেট চলবে কি করে এটার কোনো উত্তর নেই মতিয়ার কাছে। শেষ পর্যন্ত সংসার চালাতে মতিয়া বাড়তি আয়ের পথ অনুসন্ধান করে। এ প্রসঙ্গে সোহারাব হোসেনের কথা অনুযায়ী—

> ‘‘সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস আমাদের বুদ্ধিতন্ত্রী ও হৃদয়তন্ত্রীতে সময়-সঙ্কটের আবর্তে আটকে পড়া মানুষের অস্তিত্বহীনতার আর্তনাদকে মুহুর্মুহু তরঙ্গ-ধ্বনিতে প্রেরণ করেন। সেখানে উপন্যাসে-উপন্যাসে মূর্ত হয় ব্যক্তির অস্তিত্বহীনতার সঙ্কট, সমাজের অস্তিত্বহীনতার সঙ্কট এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্ব মানবাত্মার অস্তিত্বহীনতার সঙ্কটের চালচর্যা।’’[২০]

অর্থাৎ জীবনযুদ্ধে বিধ্বস্ত মানুষের প্রাণসত্তা প্রতিবাদ-প্রতিরোধে নয়, সমঝোতার পথে প্রায়শই খোঁজে মুক্তির পথ। উপন্যাসের নায়ক মতিয়াকে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় প্রথম দিকের ক্ষোভ ও রাগ ভুলে গিয়ে সুরু ও লক্ষ্মীর সঙ্গে সে সমঝোতার পথে হাঁটতে চায়।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের পটভূমি মূলত গ্রামকেন্দ্রিক, তাই গ্রাম ভিত্তিক মানুষের জীবনে ওঠানামা, জটিলতা, রহস্যময়তা এবং ক্রম পরিবর্তনশীলতা তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে প্রায়শই লক্ষ করা যায়। আলোচ্য উপন্যাসেও দেখা যায় মতিয়ার গ্রাম হাতিটিলা গ্রাম— এখানকার মানুষের দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী। দারিদ্র্যের এতটাই প্রকোপ যে দুবেলা-দুমুঠো খাবার পায় না এখানকার প্রান্তবর্গীয় মানুষজন, তা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মতিয়া ও লোকনাথের কথোপকথন থেকে জানা যায়—

> ‘‘উনুন জ্বলবে না বলে মতিয়াও বিশেষ মাথা থামায় না। লোকনাথের চায়ের দোকানে বাকির খাতা যতদিন আছে, দিন চলে যাবেই। লোকনাথের সঙ্গে যুক্তি আছে প্রতিদিন অফুরন্ত চা ও সকাল-বিকাল রুটি ধার পাবে সে। এর বেশি লোকনাথ খাতায় তুলতে

রাজি নয়। আর মাসের প্রথম তারিখ পাই-পয়সা শোধ না দিলে দোকানের সীমানায় ঢুকতে দেয় না লোকনাথ।”[২১]

এছাড়াও উপন্যাসে দারিদ্র্যের ছাপ মতিয়ার পোশাক পরিচ্ছেদের মাধ্যমেও ফুটে ওঠে এভাবে—

“পাইকারি মাপেরে স্কুল ড্রেস—খাঁকি হাফ-প্যাণ্ট এবং শার্ট—বেঁটে শরীরটায় কাঁধের নিচে এক বিঘৎ পুট নেমে থাকে। এই মার্কামারা পোশাক ছাড়া গত দশ-বারো বছর এলাকার লোক মতিয়ার দেহে অন্য কিছু চরতে দেখেনি। হাফ-প্যান্টের ভাঁজ ফেঁসো হয়ে ঝালরের মত ঝুলে পড়েছে, জামাটি তেল চিটচিটে।”[২২]

পরবর্তীকালে জীবন জীবিকার জন্য মতিয়ার প্রতিবাদী সত্তা জেগে ওঠে এবং গ্রামের মানুষ সেই প্রতিবাদে সামিল হয়। কিন্তু মোহন সিংহের দলবল সশস্ত্র ও অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়ায়, মতিয়ার নতুন জমিতে অধিকার নিতে এসে মোহন সিংহের গুণ্ডা বাহিনীর খপ্পরে পড়ে। আচমকা আক্রমণে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং এই রোষ সম্পূর্ণটাই মতিয়ারের উপর গিয়ে পড়ে। উচ্চবর্ণের দ্বারা অত্যাচারিত এই মানুষগুলির দুর্বলতার সুযোগ নিতে হাতছাড়া করে না মৌলবির দলও। তারা ধর্মান্তরিত করে অনেক মানুষকে, এমনকি মাতিয়াকেও ধর্মান্তরিত হতে হয়েছে তার নাম মতিয়া থেকে মতিন হয়ে যায়। শত আঘাত সত্ত্বেও মতিয়া মাটির টান বা শিকড়ের টান কখনোই ভুলতে পারেনি। তাই তো মতিয়া সুস্থ হওয়ার পর কলকাতা ফিরে এসেছে ঠিকই কিন্তু তা চিরকালের জন্য নয়। কলকাতার নিশ্চিত জীবনের মোহ ত্যাগ করে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে নিয়ে চিরতরে অনিশ্চয়তার অন্ধকার ঘেরা পিতৃভূমির হাতিটিলায় ফিরতে চায়—আসলে পিতৃভূমির প্রেক্ষাপটে দেখা যায় কোথাও ‘পিতৃভূমি’ হিসেবে পরিচয় চিহ্ন নিয়ে মানুষগুলো থিতু হতে পারে না। রাজনীতি অর্থনীতি ও সামাজিক কারণে, মতিয়াদের মতো মানুষরা মরীচিকার মতো পিতৃভূমি খুঁজেই যায়। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

“দলটা দরাজ পেরিয়ে যায়। রাস্তায় কেউ জিজ্ঞাসাবাদ করে না। সবাই ব্যস্ত। শুধু অদ্ভূত নীল আকাশের মাঝে সূর্য জ্বলছে। ওর নাম সময়। দলটা নিঃশব্দে ভয়ংকর অজানা

ভবিষ্যৎ মাথায় নিরাপত্তার সামান্য ভূখণ্ডের জন্য সেই সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে কোথাও পৌঁছুতে চায়! তাদের পিতৃভূমি!''[২৩]

লেখক এই উপন্যাসে একদিকে দেখিয়েছেন মতিয়ার জীবিকা অর্জন বা ব্যক্তি জীবনের প্রতিচ্ছবি আবার অন্যদিকে দেখিয়েছেন শিকড়ের সন্ধানে বা পারস্পরিক জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের ছবিকে। মূলত মতিয়াকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি রচিত হলেও এটি কিন্তু কোনো ব্যক্তি মানুষের ট্র্যাজিক কাহিনির আখ্যান নয়। লেখক ব্যক্তি চরিত্র অবলম্বন করে উত্তরাধুনিক বিশ্বের বিশ্বায়িত সভ্যতার বৃহত্তম সত্যকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। কারণ বর্তমান সময়ে দেখা যায় হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হচ্ছে এবং শিকড় চ্যুত হচ্ছে, আর সেটা কোনো রাজনৈতিক দাঙ্গার ফলে নয়। এর প্রধান কারণ জীবন-জীবিকার তাগিদ। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে আজ দুবেলা দু-মুঠো অন্ন বস্ত্রের জন্য মানুষকে তাদের পিতৃভূমি বা শিকড় ছেড়ে স্থানান্তরিত হতে হচ্ছে—এই সমাজ বাস্তবতাই আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে।

দুই ঠিকানা : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'দুই ঠিকানা' উপন্যাসটি হলো দেশ ভাগের যন্ত্রণা এবং আদর্শ নিষ্ঠ আদিনাথের ঠিকানা অনুসন্ধানের ইতিহাস। তবে এই আদিনাথের ঠিকানা মূলত তিনটে। প্রথমত, ছিন্নমূল হওয়ার আগে আদিনাথ থাকতো বাংলাদেশে। দ্বিতীয়ত, পার্টিশনের পর কলকাতার বস্তিজীবন এবং তৃতীয়ত, পুঁজি বা নাগরিক কলকাতার চাপে ডায়মন্ডহারবারের নতুন ঠিকানায় সপরিবারে বুকে যন্ত্রণা নিয়ে আদিনাথের পুনর্বাসন। ছোটো প্রিয়নাথের হাত ধরে অনেক রক্তের নদী পেরিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন আদিনাথ। কিন্তু সময় পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিতে না পারার জন্য অবশেষে আদিনাথ-প্রিয়নাথ পরিবারকে সম্মুখীন হতে হয় এক বিচিত্রময় অস্তিত্বহীন ধ্বংসের কিনারায়। যে আদিনাথ একটা শক্ত আদর্শকে দাঁড় করিয়ে নিজের পরিবারকে গড়ে তোলার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেন কিন্তু পুঁজিবাদী শক্তির হাওয়ায় তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। সময়ের এই কঠিন স্রোতের তালে আদিনাথকে কলকাতা ছেড়ে আসতে হয় ডায়মন্ড হারবারে কোনো এক প্রান্তবর্তী গ্রামে। এটাই হলো আপাতত তাদের নতুন ঠিকানা। মাথা গোঁজার ঠাঁই বদলাতে বদলাতে আগামী ভবিষ্যৎ হয়তো পাবে নতুন ঠিকানার অনুসন্ধান। যার স্পষ্ট

ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন যখন প্রিয়নাথ বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচল চিত্তে খোকার উদ্দেশ্যে বলে—"কি হয়েছে! আমি না পারি, তোরা তো পারবি!"[২৪]

এরকম স্বপ্ন নিয়েই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মতে—

> 'এক সময় আমাদের মনে হতো, কারও মেনিফেস্টো বা বক্তব্যকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করাই সাহিত্যের দায়বদ্ধতা। কিন্তু আমাদের আরও ব্যাপক, ব্যাপ্ত জায়গায় যেতে হবে। সাহিত্যের কোনো দায়বদ্ধতা নেই তাও আমি বিশ্বাস করিনা। কিন্তু দায়বদ্ধতা হলো শক্তি নিঃসরণের, স্বপ্ন তৈরি করার।' —সাক্ষাৎকার, আজকের প্রহরী, ১৪০৩।

অর্থাৎ লেখক 'দুই ঠিকানা' উপন্যাসের শিল্পের শর্ত মেনেই আদিনাথ-প্রিয়নাথের ক্ষয় যুক্ত স্বপ্নের অন্তিম রশ্মিটুকু পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে চান এবং এখানে লেখক বিষণ্ণতার যে ভার সেটাকে লাঘব করার চেষ্টা করেন।

উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় দেশভাগ পরবর্তী সময়ে ওপার বাংলা থেকে যে উদ্বাস্তু বা বাঙালিরা এদেশে এসেছিল তারা কলকাতাকে এবং পার্শ্ববর্তী বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ প্রভৃতিকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। তৎকালীন সময়ে এইসব অঞ্চল ছিল একেবারেই ছিন্নমূল। এরপর যখন ধীরে ধীরে উন্নয়নের গতিধারা কলকাতায় এসে পৌঁছল তখন দেখা যাচ্ছে তারা আর আগের ঠিকানা অর্থাৎ কলকাতায় থাকতে পারে না। কলকাতা তাদের হাতে যারা পুঁজি বা মূলধনের মানুষ। একদিন যারা এই কলকাতাকে নতুন করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল তারাই আস্তে আস্তে এই কলকাতা থেকে ছিন্নমূল হয়ে যাচ্ছে। তাদের ঠিকানা হয়ে গেল ডায়মন্ডহারবার, বারাসাত প্রভৃতি স্থানে। এই নতুন জীবিকা বা নতুন উন্নয়নের জোয়ারের ফলে প্রথম দিকের যারা বসবাস গড়ে তুলেছিল তারাই আজ দূরে সরে গেল। উন্নয়নের নামে এই অর্থ বা পুঁজিবাদী মানুষগুলি অর্থের জোরে কলকাতাকে দখল করতে শুরু করলো। অথচ যে কলকাতাকে এক সময় মধ্যবিত্ত ও সংস্কৃতিবান বাঙালিরা ওপার বাংলা থেকে এসে গড়ে তুলেছিল ধীরে ধীরে দেখা যায় সেখানে তাদের আর বাসস্থানের কোনো জায়গাই রইলো না। যার দরুন তাদের দুই ঠিকানা হয়ে গেল। অর্থাৎ লেখকের মতে, এই পুঁজি, মূলধন এবং তার যে আগ্রাসনী

ভূমিকা এসবের ফলে সুস্থ জীবনবোধ ও সংস্কৃতি ভাবনা সম্পন্ন মানুষগুলি ধীরে ধীরে আমাদের সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে ছিন্নমূল হয়ে যাচ্ছে একেবারে দূর থেকে বহুদূরে। যা আদিনাথ-প্রিয়নাথের মধ্যে পরিলক্ষিত। তাদের নিজের জীবন জীবিকা গড়ে তোলার জন্য তারা যেমন নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে এবং সেই সঙ্গে শিকড় গড়ারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু পুঁজির চাপে উন্নয়নের চাপে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে অন্য ঠিকানায়। কলকাতা নামক যে সাংস্কৃতিক রাজধানী সেটা ক্রমান্বয়ে পরিণত হচ্ছে ভিন্ন সংস্কৃতির কেন্দ্রে। তাই 'দুই ঠিকানা' উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় অর্থের বা পুঁজির চাপে কীভাবে আদিনাথ ও প্রিয়নাথের জীবন-জীবিকার পরিবর্তন ঘটে তারই দৃশ্য পট।

উদ্যোগ পর্ব : সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের মধ্যে চলমান জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তনকে এক শিল্পের বাস্তবতায় প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর উপন্যাসে যেমন একদিকে জীবন সংগ্রাম ও জীবিকা অর্জন করে বেঁচে থাকার তাগিদ ঠিক অন্যদিকে সংস্কৃতি বা Culture-কে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস। আলোচ্য 'উদ্যোগ পর্ব' উপন্যাসে লেখক গ্রাম জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। সাধন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘ ষাট বছর ধরে এই আদিবাসী ওরাঁও পাড়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওরাঁওরা তৎকালীন সময়ে কেনা জমির মালিক ছিল। কেননা তখনো আদিবাসীদের জমি কেনার কোনো আইনি অধিকার চালু হয়নি। লেখক যেহেতু এই ওরাঁও সম্প্রদায়ের মানুষের বিবাহ, মৃত্যু, বিশ্বাস, দেবদেবী, ভূত-প্রেত প্রভৃতি দেখতে দেখতে বড়ো হয়েছিলেন তাই তাদের কৃষি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত। কিন্তু পরবর্তীকালে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু আর্থিক ভাবে তারা পিছিয়েই ছিল। তবে তাদের জীবনযাত্রায় কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ যে আদিবাসী সমাজের মানুষরা দীর্ঘ একশো দেড়শো বছর ধরে একটা অঞ্চলে অবস্থিত আছে সেখানে তাদের এক দিকে যেমন চেতনার বৃদ্ধি ঘটছে আবার অন্যদিকে সেই আদিবাসীরা কিন্তু তাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলছে। কেননা এই আদিবাসীরাই কিন্তু বাঙালিদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যে বাংলায় কথা বলার প্রবণতা দেখায়। এই যে পুরনো সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের একটা ঢেউ চলে আসছে এবং আস্তে আস্তে তাদের Identity বা আত্ম পরিচয় পাল্টে যাচ্ছে, সেটাই লেখক তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে যেমন আত্ম পরিচয় রক্ষার প্রয়াস আছে তেমনই প্রযুক্তি ও আধুনিকতার সঙ্গে একাত্ম হতেও আগ্রহী দেখা যায়।

ছোটনাগপুর অঞ্চলের 'ওঁরাও' সমাজের মানুষেরা প্রায় দুই শতাব্দী আগে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছিলেন উত্তর বিহার, দক্ষিণ বিহার (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। চব্বিশ পরগনার B. T. রোডের ধারে পানশিলা, তালবান্দা নামের গ্রামগুলির প্রান্তদেশে গড়ে উঠেছে তাদের বসতি। সেখানে জমি মালিকদের জমি চাষ করে তারা। চিরকালই তারা শোষিত হয়েছে কারণ তারা হিসেব করতে পটু নয়। চাষিদের স্বপক্ষে তৈরি হওয়া নতুন আইনও তারা জানে না। কিন্তু দিন বদলায়। রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যেও সত্যিকারের আদর্শ নিয়ে কোনো কোনো মানুষ এই জনগোষ্ঠীকেও তাদের প্রাপ্য অধিকারের পথে নিয়ে যেতে সহযোগী হন। কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে তাদের সংঘাত বাঁধে। রাজনীতির ক্ষমতা চক্রের বৃত্তে থাকা ব্যক্তিরাও ওঁরাওদের মন আর প্রকৃত মঙ্গল কোথায়—তার কোনো হিসেব রাখে না। এই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা উপন্যাস 'উদ্যোগ পর্ব' (১৯৮২)।

বর্তমান সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলক উপন্যাস

ধরিত্রী : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'ধরিত্রী' (২০০৭) উপন্যাসটি বর্তমান সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি দিক নির্দেশক বলা যেতে পারে। আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্র প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক নিখিলেশ তলাপত্র। নিখিলেশ তলাপাত্রের প্রাক্তন ছাত্র বংশী সরকার, যিনি পেশায় A. D. I. ছিলেন। এই দুজনের কথোপকথনের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের বর্ণনা গতি পায়। বংশী বিভিন্ন কথা প্রসঙ্গে অন্নপূর্ণা স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা ধরিত্রী ভট্টাচার্যের কথা সম্পর্কে নিখিলেশবাবুকে অবগত করার চেষ্টা করেন। পরক্ষণেই নিখিলেশের বুঝতে অসুবিধা হয় না বংশীর মনে কি চলছে। কারণ তিনি জানতে পারেন তাদের সর্বশক্তিমান শিক্ষক সংগঠনের অন্যতম জেলা সম্পাদক কমলেশ ভট্টাচার্য তাদের সংগঠনের সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম মুখ ধরিত্রী ভট্টাচার্যকে হাজির করার উদ্যোগ নেন। ঐ নারী ঐতিহাসিক শিক্ষক ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের বালিকা বিভাগে কিছুদিন শিক্ষকতা করে, কোথায় যে হারিয়ে গেলেন কেউ তাঁর খোঁজ পায়নি। স্কুলের ঐতিহাসিক সুবর্ণ জয়ন্তীতে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যাঁরা সূচনায় চুয়ান্নর শিক্ষক আন্দোলনে ছিলেন, জীবিত থাকলে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। যদিও অধিকাংশরাই প্রয়াত। তালিকায় সেরকম ভাবেই ধরিত্রী ভট্টাচার্যের নাম ছিল কিন্তু

আপ্রাণ চেষ্টা করেও খুঁজে খুঁজে তাঁর সন্ধান পায়নি কর্তৃপক্ষ। আসলে, এই উপন্যাসে শিক্ষিকাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার পেছনে যে গূঢ়ার্থ লুকিয়ে আছে তা হলো—'ধরিত্রী' নামের মিথকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের পজিশন জোরদার করা। ধরিত্রী ভট্টাচার্য মৃত জেনেও বংশী তার নিজের প্রয়োজনে যেভাবে ধরিত্রী ভট্টাচার্যের নাম ও যশকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন তা নিখিলেশ অচিরেই বুঝতে পারেন। আসলে বংশীর নিজস্ব স্বার্থ হলো সে D. I. হতে চায়। আর এই ধরিত্রী ভট্টাচার্যের নাম সংগঠনের কাজে ব্যবহার করতে পারলে তার পদোন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। এই বিষয়টি নিখিলেশের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। উপন্যাসে ধরিত্রী দেবীকে অনুসন্ধান করে বের করার যে প্রবণতা সেই সক্রিয়তার পাশাপাশি আরও একটি নতুন দিক লক্ষ করা যায় তা হলো—বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ক্যারিয়ার তীর্থ'। এই 'ক্যারিয়ার তীর্থ' নামক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোক্তারা হলেন প্রাক্তন ছাত্র নিশীথ এবং তার শিক্ষা বিভাগের সোর্স দীপেন, দীপ্ত, ফ্লোরিডাবাসী মি. ভৌমিক প্রভৃতি। তাদের এই আগ্রাসনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য বা সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে প্রয়োজন একজন 'মিথিক্যাল ম্যান'। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান 'মিথিক্যাল ম্যান' হিসেবে তারা চাইছেন নিখিলেশ তলাপাত্রকে। সেজন্যই তারা বিভিন্ন উপায়ে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। ভৌমিকের কথায়—

> ''মাস্টারমশাই আপনার সাহায্য অন্যভাবে চাই আমরা। ...ক্যারিয়ার তীর্থের একজন অগ্রণী হিসেবে...প্রোমোটার হিসেবে রইলেন!''[২৫]

তাঁর আরও মন্তব্য—

> ''আমাদের লক্ষ্য স্পষ্ট। ...আমরা কিছু সৎ ও খ্যাতনামাদের জড়াতে চাই। তাঁরা পথ দেখাবেন আমাদের।''[২৬]

অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কীভাবে বিভিন্ন খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদদের যশকে সামনে রেখে তার আদলে চলে এক ব্যবসায়িক বৃদ্ধির কারবার। এই মিথ বিনা পয়সায় নয়, বিনিময়ে অর্থপ্রাপ্তির এক বিরাট মনোভাব তাদের সংলাপে ধরা পড়ে। শেষ পর্যন্ত নিখিলেশ তাতে অসম্মতি প্রকাশ করলেও ড. ভৌমিক আরও স্পষ্ট করে বলেন—

"আসলে কি জানেন স্যার, সব পদ্ধতিই খোঁজে প্রতীক চরিত্রদের, আর্কিটাইপাল চরিত্র, মিথদের...যাদের ঘিরে সমাজে আবেগ মথিত হয়...এটা সামাজিক নিয়ম। মিথ শক্তি যোগায়...প্রযুক্তির নতুন শিক্ষা হাজির হলেও...আমরা তাই আপনাদের খুঁজছি...কিছুটা আপনারা আর্কিটাইপাল হয়ে পড়েছেন...এগুলো উপেক্ষা করা যায় না।"[২৭]

এই কারণেই সংগঠনের কর্তৃপক্ষ ধরিত্রী ভট্টাচার্যের খোঁজ পেতে পুনরায় নিখিলেশের শরণাপন্ন হন। শিক্ষক সংগঠনের তত্ত্বাবধানে ১৯৫৪-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ধরিত্রী ভট্টাচার্যকে ডেকে আনা হয় এবং সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ধরিত্রী ভট্টাচার্য বলে যাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে, সে আসল নয়, নকল ধরিত্রী ভট্টাচার্য। এরপর দীনেন গুপ্ত মামলা করায় সত্যটা বেরিয়ে আসে। জানা যায়—"উনি নন্দিনী ভট্টচার্য।...ধরিত্রীরই বোন...পিঠোপিঠি... একই বয়সের...উনিও শিক্ষিকা।"[২৮]

এই ঘটনায় নিখিলেশ স্তম্ভিত হয়ে যান। এমনকি নিজেকেও তার নকল বলে মনে হতে থাকে।

আলোচ্য উপন্যাসে Institutional Power-এর কেন্দ্র দুটি, (ক) শিক্ষক সংগঠন, এবং (খ) ক্যারিয়ার তীর্থ। তৎকালীন সরকারের জামানায় বিগত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের যেকোনো প্রান্তের স্কুলেই হোক না কেন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা একটি শিক্ষক সংগঠনের আধিপত্য বিস্তার দেখে এসেছেন। শুধু নাম মাত্র শিক্ষক সংগঠন হলেও এটি মূলত তৎকালীন শাসকদলের পার্টির শাখা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। শিক্ষকদের মঙ্গল সাধনের অপেক্ষা বড়ো হয়ে উঠেছিল ক্ষমতা ভোগ করার এক অদম্য প্রয়াস। অর্থাৎ শিক্ষকদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব প্রদানের কম্পিটিশন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের এক অবিরাম বাসনা। এর ফলে নিজেদের খ্যাতি, যশ হারিয়ে পরিশেষে শিক্ষক আন্দোলনের প্রথম দিকের স্বার্থত্যাগী ও আত্মত্যাগী যশ সম্পূর্ণ শিক্ষকদের ইমেজ ব্যবহার করতে তারা উঠে পড়ে লাগেন খুব সচেতনভাবে। এই উপন্যাসে শিক্ষক সংগঠনের এই প্রাথমিক পর্যায়টি অতি সাম্প্রতিক কালের বঙ্গীয় শিক্ষকের বাস্তবতার সঙ্গে মিশে ফুটে উঠেছে। অনুরূপভাবে এই আখ্যানের অন্যতম প্রধান চরিত্র অন্নপূর্ণা গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা ধরিত্রী ভট্টাচার্য একজন মিথিক্যাল মানুষ। ৫৪-এর শিক্ষক আন্দোলনে তিনি স্বয়ং রাজপথে বসিয়েছিলেন। প্রশ্ন হলো, সংগঠনের কর্তা ব্যক্তিরা এতদিন পর কেন ৫৪-র

আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের সংবর্ধনা দিতে উদ্যোগী হলেন? লেখকের ভাষায় বলা যায়—'ক্ষমতাবান শিক্ষক সংগঠনের কর্তাব্যক্তিরা হয়ে পড়েছিলেন সুবিধাবাদী। অনেকেই ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলেন। সেই ক্ষমতা বজায় রাখতে এই ক্ষমতাধিকারীদের দরকার হয়েছিল, দরকার হয় মিথিক্যাল মানুষের। ধরিত্রী ভট্টাচার্য হয়ে উঠেছেন তাঁদের এই উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার।'

অর্থাৎ ধরিত্রী দেবীর লড়াইকে স্বীকৃতি দেওয়া এদের লক্ষ নয়। এঁদের উদ্দেশ্য নিজেদের সংগঠনের ভিতকে শক্ত করতে এবং নিজেদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করতে ধরিত্রী দেবীর মিথকে ব্যবহার করা। তাই ধরিত্রীর জায়গায় শিক্ষিকা নন্দিনী হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। কারণ আজকের জনগণ ধরিত্রী ভট্টাচার্যকে চেনে না এমনকি তাদের চোখে এই বিষয়টি ধরাও পড়ে না। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় লেখকের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতা কতোটা বাস্তববাদী ও চিন্তাশীল। তাঁর শাণিত লেখনীর সাহায্যে শিক্ষক সংগঠনের এই অন্তরালের পর্দা শত ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে। এমনকি ব্যক্তিগত ক্ষমতা লিপ্সা ভোগের যে চিত্র সেটাও নগ্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের সংগঠনের ক্ষয়িষ্ণু দশায় সংগঠন দূরে সরে যায়, ব্যক্তি স্বার্থই প্রধান হয়ে ওঠে। আর এই সমাজ বাস্তবতার চিত্র ফুটে ওঠে লেখকের বয়ানে। ঠিক একইভাবে এখানেও ধরিত্রী গৌণ হয়ে পড়েছে। শিক্ষকদের বিভিন্ন নৈতিক দাবিদাওয়া, শিক্ষার বেসরকারিকরণ এসব নিয়ে আলোচনা বড়ো হয়ে উঠেছে। নিখিলেশের নিঃস্বার্থভাবে পুরনো দিনের মূল্যবোধ নিয়ে প্রতিবাদ করলেও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা তাতে কর্ণপাত করেন না। ধরিত্রীর স্কুলে নন্দিনীকে নিয়ে এসে ধরিত্রী হিসেবে উপস্থিত করা তাদের কাছে চিটিং বলেও মনে হয় না। বরং—''শিক্ষক-শিক্ষিকারা দেখলেন আমরা ঐতিহ্য ভুলিনি...সংগ্রামী রাস্তা থেকে সরে আসেনি...এতে আমাদের পাল্টা সংগঠন কোণঠাসা।''[২৯] এই ভাবনাতেই তারা তুষ্ট হয়ে থাকে।

উপন্যাসের আখ্যানে ক্ষমতার অপর একটি কেন্দ্রের নাম 'ক্যারিয়ার তীর্থ'। বিশ্বায়নের প্রভাবে অধিকাংশ দেশই পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সর্বত্রই দেখা যায় পুঁজির দাপট। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। আর বিশ্ব লগ্নিপুঁজির আজ অন্যতম টার্গেট শিক্ষাঙ্গন। যেখানে কখনো লোকসান হয় না কিন্তু পুরোটাই লাভের অংশ। তাই দেখা যায় বর্তমানে বাংলা মাধ্যম নির্ভর স্কুলগুলিকে দুর্বল করে দিয়ে বেসরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে বেসরকারি

লগ্নি পুঁজি সদা তৎপর হয়ে উঠেছে। 'ক্যারিয়ার তীর্থ' সেই বাস্তবতারই একটি মূর্ত প্রতীক। তাই পরিশেষে ড. ভৌমিক থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতা প্রত্যেকেই জড়িয়ে যান স্বার্থের কারণে। এই উপন্যাসে ক্ষমতা বজায় রাখার এবং তার জন্য নীতিহীন মূল্যবোধহীন কৌশলের দিকটি অকুণ্ঠ বাস্তবতায় উঠে এসেছে।

তেঁতুল পাতার ঝোল : কথাসাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সাম্প্রতিক বাস্তবতাকে তাঁর লেখা 'তেঁতুল পাতার ঝোল' (১৯৯৫) উপন্যাসে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবর্গ ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করার জন্য এক কুৎসিত খেলায় মেতে ওঠে। স্কুল ও কলেজে প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে ল্যাম্পপোস্ট হিসেবে রেখে ম্যানেজিং কমিটিতে নিজস্ব দলের লোক বসিয়ে শিক্ষাঙ্গনে দলতন্ত্রকে কায়েম করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করার এক সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এর ফলে একদিকে দেখা যায় সরকারি স্কুলে ইংরেজি মাধ্যম কার্যত তুলে দিয়ে অন্যদিকে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সমর্থন প্রদান। এমনকি এর জন্য তৈরি হয় শ্রেণি বৈষম্য। লেখক নিজেও শিক্ষকতায় যুক্ত ছিলেন। সাতের দশক থেকে বর্তমান শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত তার যে অভিযান এসবেরই তিনি সাক্ষী থেকেছেন। ফল স্বরূপ আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যানে বঙ্গীয় শিক্ষক সমাজ, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ক্ষমতায়নের যে নোংরা রাজনীতি এইসব বিষয় লেখকের চিন্তনে বাস্তবতা সহিত প্রত্যাশিত ভাবে উঠে আসে।

উপন্যাসের আখ্যানের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'ঈশ্বর পাঠশালা'। প্রবীণ শিক্ষক প্রণবেশ তরফদারের কথা দিয়ে আখ্যানের শুরু হয়। কথক জানান—"ঠিক দু ঘন্টা আগে, প্রণবেশ তরফদার ভাবতে পারেন নি, সমস্ত অপমান, ক্ষোভ ও হীনমন্যতা ধুয়েমুছে মেজাজটি ফের অপ্রত্যাশিত চাঙ্গা হয়ে উঠবে।"[৩০] এর থেকে বোঝা যায় এ যেন প্রচলিত উপন্যাসের মতো নয়, বরং এটি ছোটোগল্পের মতো করে অপ্রত্যাশিতভাবে আখ্যান বর্ণনার দিকে লেখক এগিয়ে গেছেন। এছাড়াও তৎকালীন সরকারের শিক্ষক কুক্ষিগত করার যে প্রয়াস তা ধরা পড়ে, যখন শিক্ষক প্রণবেশ তরফদারকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ক্ষমতাসীন বামপন্থি দলের লোকাল কমিটির নেতা শিক্ষক

রিক্রুটমেন্টের ইন্টার্ভিউ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এ যেন শিক্ষার আদর্শকে বিলীন করার নতুন প্রয়াস। যোগ্যতা যেমনই হোক না কেন পার্টির নিজের লোককে নিয়োগ করতে হবে। যেমন এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দেখা যায় পার্টির একান্ত অনুগত শিক্ষক সুপ্রিয়বাবুর ছেলেকে নেওয়ার জন্য জোরজবরদস্তি শুরু হয়ে যায়। এমনকি পোস্ট রিজার্ভের ব্যাপারে কোনো ভ্রুকুটি না করে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হয়। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দেওয়ার ক্ষোভ উগড়ে দেওয়া হয়। যা বাস্তব সময়ের সঙ্গে একদম উপযোগী বলে মনে হয়। এই ব্যাপারে প্রণবেশবাবু বীর্যের পরিচয় দিয়ে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করলেও বাকিরা নিশ্চুপ। যদিও অন্যান্য শিক্ষকরা A B. T. A.-এর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও দলদাসে পরিণত হয়। লেখক শিক্ষার এই নগ্ন বাস্তবতাকে প্রণবেশ তরফদারের চরিত্রের মাধ্যমে অনেকটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আসলে প্রণবেশ তরফদারই যে লেখকের প্রক্ষিপ্ত ছবি তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিক্ষক প্রণবেশ এবং তাঁর স্কুল 'ঈশ্বর পাঠশালা'-কে সামনে রেখেই সাধন চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার চালচিত্রটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। প্রণবেশবাবু মনে করেন শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীরা একই পরিবারের সদস্য। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও পরিস্থিতির যে আমূল বদল ঘটেছে সে কথাও কথক জানাতে ভোলেননি। যেমন—'সদস্য কমে গেছে, টিউশনির চাপ তুলে দিয়েছে অবকাশ—তাই শতকরা নব্বই জনই ছুটির ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে ছাত্র পড়ানোর সন্ধানে।'

এর থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রণবেশ বাবুর 'ঈশ্বর পাঠশালা'-কে কেন্দ্র করে সাধন চট্টোপাধ্যায় সামগ্রিক ভাবে বঙ্গীয় স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার হাল হকিকতকে উপন্যাসের বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর অদম্য প্রয়াস ব্যাপ্তি পেয়েছে উপন্যাসের পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে।

বহুকাল থেকেই দেখা যায় স্কুল কলেজের শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা করার প্রবণতা। যদিও পেশাগত সময়ের বাইরে প্রাইভেট টিউশন করলে বলার কিছু থাকে না। কিন্তু সমস্যা তখনই তৈরি হয় যখন গৃহশিক্ষকতার প্রবল মানসিক চাপে স্কুল-কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটাই অবহেলিত ও ফাঁকিবাজিতে পরিণত হয়। অনুরূপ ঘটনা লক্ষ করা যায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও।

আর এই শিক্ষকতার ব্যবসায়িক রূপকে বাস্তবতার সঙ্গে আখ্যানে তুলে ধরেছেন লেখক 'ঈশ্বর পাঠশালা'-র মাধ্যমে। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক যেমন অমিতাভবাবু, সুপ্রিয়বাবু এমনকি হেডমাস্টার প্রণবেশবাবুরা তারই পথিক বলা যেতে পারে। আসলে গৃহশিক্ষকতা ফলে একজন শিক্ষকের সময় অনুযায়ী যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছানোর সমস্যা হয় ঠিক তেমনই শিক্ষকতার যে আদর্শ তা অর্থের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। ফলে শিক্ষাঙ্গনে যে সুস্থ পড়াশোনার পরিবেশ এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন আলোচনা প্রভৃতি সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রেই ব্যাঘাত ঘটে। তার পরিবর্তে চলে জমি, বাড়ি, Increment, L. I. C. ও রাজনীতি বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনায় সময় অতিবাহিত করা। এর ফলে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ক্লাসে না গিয়ে নিজেদের অনুপযুক্ত আলোচনায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় অধিকাংশ শিক্ষককে। যার বাস্তব রূপ বর্তমান সময়েও দেখা যায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজে।

বর্তমান সময়ের বাস্তব প্রেক্ষাপটকে লক্ষ করলে দেখা যাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও শিক্ষকদের দলাদলির একটা দৃশ্য চোখে পড়ে। আলোচ্য উপন্যাসের 'ঈশ্বর পাঠশালা'-তেও তার ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। শিক্ষকরা প্রাচীন ও নবীনদের মধ্যে নিজেদের যেভাবে বিভাজন করে নিয়েছেন, এই সমাজ বাস্তবতার স্পষ্ট রূপটি লেখক এঁকেছেন। এই নগ্ন বাস্তবতাই ফুটে উঠেছে দিবাকর, দীপঙ্কর, প্রণবেশবাবুদের কথোপকথনে। এই দলাদলি চরম আকার ধারণ করে যখন তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও যখন অবসরের বয়স ৬৫ থেকে কমিয়ে ৬০ করতে চায়। ফলে তখনই আন্দোলন শুরু হয়। বামফ্রন্টের দুটি শরিক দলের শিক্ষক সংগঠন প্রবল বিরোধিতার নামে। এর ফলে শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন তৈরি হয়। এর প্রভাব শেষ পর্যন্ত 'ঈশ্বর পাঠশালা'-য় গিয়ে পড়ে। লেখক তাঁর নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের আখ্যানে তুলে ধরেছেন কেননা লেখক নিজেও দীর্ঘদিন হুগলী জেলার একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন, সেখানকার শিক্ষকদের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল ও দলবাজি প্রবল মাত্রায় ছিল, এই হৃদয়হীনতার তিনি সাক্ষী ছিলেন স্বয়ং। এই বাস্তবতাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে উপন্যাসে উপস্থাপন করে সাধন চট্টোপাধ্যায় যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন বলে আমাদের মনে হয়। একদা 'ঈশ্বর পাঠশালা' ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের পরে এলাকায় অবস্থিত দ্বিতীয় বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু খ্যাতি সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও নতুন সময়ের নব্য ধনী মানুষের চাহিদা পূরণ করতে চাকচিক্যের মোটা অংকের টাকা খরচের বিনিময়ে বেসরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি

তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও জাঁকজমক ব্যবস্থা যেমন—রাজ্যপাল, শিক্ষামন্ত্রী, অধ্যাপক থেকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সমাগম লক্ষ করা যায়। আর এই বেসরকারি স্কুলের গ্ল্যামার ফ্যাশনে 'ঈশ্বর পাঠশালা' ক্রমশ ফ্যাঁকাসে হতে থাকে। লেখক এই উপন্যাসের আখ্যানে একদিকে সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষক, অন্যপ্রান্তে একালের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। কারণ লেখক মনে করেন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে শিক্ষার পরিবেশ ও পরিকাঠামো। সেসময় অর্থ ছিল না কিন্তু শিক্ষকতার পেশায় শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল। ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক ছিল দৃঢ় ও মধুর। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যায় অর্থ আছে, চাকরির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা আছে কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সম্পর্ক জটিলতার আবর্তে দিনের পর দিন তলানিতে এসে পৌঁছেছে। আর এই বদলে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবতাই আলোচ্য 'তেঁতুল পাতার ঝোল' উপন্যাসের পরিসরে গ্রথিত হয়েছে। বঙ্গীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকগুলি লেখক সচেতন ভাবে তুলে ধরার প্রয়াস দেখিয়েছেন এবং প্রাণবন্ত করে তুলে ধরেছেন।

দেশ-কাল ও পরীক্ষামূলক উপন্যাস

পাল্টিপুরাণ : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'পাল্টিপুরাণ' এমন একটি উপন্যাস যা লেখককে এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা রাখে। সমগ্র উপন্যাসের আখ্যানটি বর্ণনা রয়েছে কথকের জবানিতে। কথনে বারংবার ঘূর্ণাবর্তে এসেছে একটি চরিত্রের কথা। লেখক এই চরিত্রকে কোনো বিশেষভাবে চিহ্নিত না করে একটি প্রতীকী মাত্রা দান করার প্রচেষ্টা করেছেন। এটি চিরাচরিত কথাসাহিত্যের গড্ডালিকা প্রবাহে হারিয়ে যাওয়ার মতো নয়। 'পাল্টিপুরাণে' দেখা যায় 'হাটিপানা' নামক এক পৌর অঞ্চল আর এই অঞ্চলের শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়েই এর কাহিনি শুরু হয়। কথক 'হাটিপানা' পৌর অঞ্চলের সাড়ে সাত বর্গ মাইল এলাকা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন চূর্ণ ঘটনাবলীকে প্রত্যক্ষ করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেই প্রতিচ্ছবিগুলি উপন্যাসে গ্রথিত হয়েছে।

'পাল্টিপুরাণ' লেখকের একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস। কারণ এটি আর পাঁচটা উপন্যাসের মতো গতানুগতিক ভাবে পাঠকের কাছে গ্রহণ হয়নি। কেননা কোনো প্রধান চরিত্রকে অবলম্বন করে এই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে ওঠেনি। 'পাল্টিপুরাণ'-এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে একটি অঞ্চলের জনসমষ্টিকে নিয়ে। বিভিন্ন মানুষের জীবন চিত্রের রূপায়ণ লেখক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি দিয়ে

দেখেছেন। বিগত একশো বছর ধরে যে ঘটনা ধারা চলছে, লেখক সেসব ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন—থানা, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নতুন গড়ে ওঠা ফ্ল্যাট বাড়ির জনজীবন, বস্তির মানুষের জীবনযাপন, বাজার ঘাট, জনপথ সমস্ত কিছুর প্রভাব বা ছায়াপাত ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসের পাতায় পাতায়। আর এইসব কিছুকে উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করেছে একটি প্রতীকী চরিত্র, যাকে চরিত্র বলে চিহ্নিত করেছেন, তার নাম সময়। সময়ের বুকে ঘটনাপ্রবাহ যেমন করে দাগ কেটে যায় তাকেই লেখক কখনো সহানুভূতি, কখনো তির্যক দৃষ্টিতে দেখেছেন।

সাধন চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসটির মধ্যে ব্যবহৃত ক্রনোটোপের চেনা ছককে আখ্যান বর্ণনা করার সময় সচেতন ভাবে ভেঙে চুরমার করেছেন। আমরা জানি সাধারণ ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী একটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে সময় এবং স্থান সমানুপাতিক হয়। এমনকি একটি জায়গায় তাদের সহাবস্থান হয়। কিন্তু এখানে কথকের অবস্থান একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে বর্তমান অবস্থানে দাঁড়িয়ে থেকেও তিনি স্মৃতিচারণায় ফিরে গেছেন। সেই অতীতে একটি চরিত্র একটি সময় বিন্দুতে দাঁড়িয়ে এক একটি বার সংগ্রহ করেছে। আর লেখক তাঁর চোখ দিয়েই সংঘটিত ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। লেখকের মতে একটা সময় ফিক্সড করে অর্থাৎ একটা বিশেষ দিনে বিভিন্ন অঞ্চলে বা দেশে যে ঘটনাগুলি ঘটে তারই একটা মালা তৈরি করে উপন্যাসটি তৈরি হয়েছে এবং সেটার মধ্যে থেকে দেখা যাবে যে বিভিন্ন স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন ঘটনাগুলো ঘটে ঠিক একই সময়, আর তাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন লক্ষ করা যাবে। আর এই সমন্বয়টি হলো পাল্টিপুরাণের তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, কোনো এক বুধবারের দিনটি স্থির করে একটা অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় যে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, সেই ঘটনাগুলোকে তুলে আনা হয়েছে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে একটা কমন বিষয় থেকে গেছে আর এই বিষয়টি হচ্ছে ‘পাল্টিপুরাণ’-এর সারমর্ম। অর্থাৎ পুরাণে লেখক মূল্যবোধের ছবি আঁকেন। সেখানে গ্রথিত হয় ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় কথা। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে লেখক উত্তরাধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে অবনমিত মূল্যবোধের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই উপন্যাসটি ব্যতিক্রমী বলা যেতে পারে।

যখন কোনো একটা সময়কে কেন্দ্র করে উপন্যাসে তৈরি হয় এবং এই উপন্যাস যত এগিয়ে যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে সময়ও পরিবর্তিত হয় এটাই স্বাভাবিক। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নবকুমার যখন নৌকা নিয়ে আসে তখনকার সময়টা আর একদম শেষে যখন কপালকুণ্ডলা জলে পড়ে মারা যাচ্ছে তখনকার সময়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। অর্থাৎ সময় এক থাকে না পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু 'পাল্টিপুরাণে' দেখা যায় সময় স্থির থাকে, শুধু বিভিন্ন অঞ্চলের ঘটনাগুলো বদলে যায়। আর এটাই উপন্যাসের পরীক্ষার জায়গা। আসলে আলোচ্য উপন্যাসে সাধন চট্টোপাধ্যায় যে সময়কে ধরতে চেয়েছেন সেই সময় কিংবা এখনো আমাদের দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ তুঙ্গস্পর্শী হয়নি। বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী যে চেহারা আমরা এখন দেখছি, ২০০১ সালে দাঁড়িয়ে তা কল্পনাও করা যেত না। সমাজ যে সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেসবুক, টুইটার, স্মার্টফোনের দৌলতে এমনভাবে উৎকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে তা কে ভেবেছে! এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজকের কথাসাহিত্যও উত্তরাধুনিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেদিন সমাজ-পরিবেশ আলাদা থাকায় দুই যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দদুল্যমান ছিল শিল্পী সত্তা। তাই উত্তরাধুনিকতার ছাপ পড়লেও আধুনিকতাবাদী Deterministic বয়ান নির্মাণেই ছিল তখনকার সার্বিক প্রবণতা। এই প্রবণতাই 'পাল্টিপুরাণ'-এর পশ্চাদভূমি।

গুল্মলতার ইলেকট্রন : সাধন চট্টোপাধ্যায় লেখা 'গুল্মলতার ইলেকট্রন' উপন্যাসটি সমাজ ব্যবস্থার আলোকে ও প্রকরণের ধারায় অন্যতম মাইলস্টোন বলা যেতে পারে। সমগ্র উপন্যাসটি কথকের কথনের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আখ্যানের বিশেষ অবস্থান বলতে হেমরঞ্জনের বাস্তু জমিকে বোঝায়। এই উপন্যাসে সাধারণত আখ্যান নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথাগত যে গণ্ডি তা থেকে লেখক সচেতনভাবে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। এমনকি নিজের সৃষ্টি শৈলীকেও মুক্ত রেখেছেন। এছাড়া উপন্যাসে যে আখ্যান গড়ে উঠেছে তা মূলত হেমরঞ্জনের অবসরকালীন জীবনযাত্রাকে নিয়ে। যদিও সেই আখ্যানগুলি অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়। এছাড়াও বাকি চূর্ণগুলো আরও বেশি তুচ্ছ এবং বিবর্ণ। সাধারণভাবে পাঠকের মনে প্রশ্ন ওঠে লেখক হঠাৎ করে কেন প্রথাগত স্রোতের উল্টোরথে এই সচেতন যাত্রায় ব্রতী হয়েছেন? এ প্রসঙ্গে লেখকের দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লেখক নিজেই জানিয়েছেন—'আমি উপন্যাসটি লিখেছি আঙ্গিক নিয়ে সচেতন পরীক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে। গল্প বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। তথাকথিত উপরিতলের বাস্তবতার প্রতিফলন দেখানোও

আমার লক্ষ নয়। আমি চেয়েছি ভেতরের বাস্তবতার আড়ালে লুক্কায়িত বাস্তবতা দেখাতে। আর তা করতে হলে গল্প বলার প্রলোভন বর্জন করতে হতো। তাই এই উপন্যাস কাহিনি নামক মেদকে বর্জন করেছে।'

আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যানের উপরিতলে স্থান পেয়েছে যৌথ পরিবারের একটি বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি। এই যৌথ পরিবারের অভিভাবক হলেন বয়োজ্যেষ্ঠ হেমরঞ্জন মজুমদার। পরিবারের মধ্যে রয়েছে হেমরঞ্জনের কন্যা গীতা ও তার স্বামী, রয়েছে পুত্র দীপ্তরঞ্জন ও তার স্ত্রী মিরা, সে একজন স্কুল শিক্ষিকা। সে এখন অসুস্থ। রয়েছে মেজ মেয়ে বেরা ও তার স্বামী মৃণাল, ছোটো বোন ঝুলন ও তার স্বামী শক্তি। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় অর্থনৈতিক চাপে হেমরঞ্জনের মতো বাঙালি যৌথ পরিবারগুলি বিলুপ্তের পথে। এমনকি এখনো যেটুকু রয়েছে সেগুলিও একদিকে আর্থিক অনটন ও অন্যদিকে পরিবারের ঈর্ষার চাপে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আখ্যানে সেই ভঙ্গুর যৌথ পরিবারগুলির একটি বাস্তব দলিল আমরা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি। আমরা বাস্তব সমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাবো এখনো অনেক পরিবার আছে যেগুলি একই ছাদের তলায় বাস করে অথচ একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রয়েছে সম্পর্কের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফাটল বা ছেদ। এই ফাটল বা ছেদের কারণ হলো সম্পত্তির অধিকার নিয়ে, যার মূল কথা হলো অর্থনৈতিক জোগান। এছাড়াও দেখা যায় চারদিকে ফ্ল্যাট কালচারের প্রভাবে পরিবারের মধ্যে ভালো মূল্যের বিনিময়ে জমি বিক্রি করার যে একটা প্রচেষ্টা সদস্যদের মধ্যে দেখা যায় সেটাও অনেকাংশে প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে প্রত্যেকেই নিজের ভাগবাটোয়ারার দিকে নজর দেয় এবং সম্পর্কের মধ্যে একটা ফাটল সৃষ্টি হয়। এর ফলে ঝুলন ও শক্তির মতো হয়তো সবাই মনে করে—

> ''আজ, পাঁচিলের কোণায় পুরনো মস্ত আমগাছটায় বিশাল একটি চাক ঝুলে আছে। মৃণাল তাকিয়েও দেখে না। নির্জনে কোন মানুষের লোভ-দৃষ্টি চাকটাকে বিঁধতে পারে না বলে, হিংস্র নয় তারা। কেবল ২৪ ঘণ্টা মৃদু গুনগুন আওয়াজ। মৃণাল ইদানীং বুঝতেও চায় না, সারা বাড়িটায় গুল্মলতারা কেন প্রসারিত হয়ে সব কিছু আবৃত রাখার খেলায় মেতে উঠেছে। বাড়িটার ছাদ, জানালাদরজা, গাছ-গাছালির মাথায় চাঁদের আলো পড়লে মনে হয়,

রহস্যময় অর্কিড-গৃহ। মৃণাল জানে এইসব ঝোপঝাড়ের ডগাগুলোয় ইলেকট্রন আছে, প্রোটন আছে। ওরা চাইছে বাড়িটাকে গিলে খেতে অর্থাৎ পরিবারগুলোকে। সবুজের ছদ্মবেশে কণাগুলো নাচে, লাফায়, শক্তি ক্ষয় করে এবং যে-কোনও মুহর্তে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সব কিছুর অস্তিত্ব নির্মূল করতে পারে।"[৩১]

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মতে একালের ভঙ্গুর প্রায় বাঙালি যৌথ পরিবারের এই বাস্তব চিত্রগুলি হলো শুধুমাত্র উপরিতলের বাস্তবতার চিত্রায়ন মাত্র। ভাষাতাত্ত্বিক সমালোচনার পরিভাষায় আমরা একে Surface Structure বা বহির্ভাগ বলতে পারি। আবার এর অভ্যন্তরে যে বাস্তবতা দেখা যায় সেটাকে উপন্যাসের Deep Structure বলা যেতে পারে। আর এই Deep Structure ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকে উপন্যাসের নামকরণের বিষয়টি। যদিও আলোচ্য 'গুল্মলতার ইলেকট্রন' নামটি অনেকটাই চিত্রধর্মী। 'গুল্মলতার ইলেকট্রন' শব্দবন্ধটি উচ্চারণ করার সময় আমাদের অনুভূতি বা অনুভবের দৃষ্টিশক্তিতে বাইরের দৃশ্যমান জগতের পর্দাটি সরে যায়। তার পরিবর্তে বস্তুর অবভাসিক রূপের আসল চিত্রটি আমাদের সামনে আর আসল রূপ বলে মনে হয় না। উপন্যাসের মধ্যে গুল্মলতার অজৈব বস্তুগুলি আসলে প্রোটন, ইলেকট্রনের রূপ বলেই পরিগণিত হয়। আর সেসব ইলেকট্রন, প্রোটন কণাতেই থেকে যায় লোভ-লালসা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ (Realism of Alienction) আর এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতীকী মূর্ত হয়েছে চরিত্রগুলির বিভিন্ন রকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, চিন্তনে ও কার্যকলাপে। এইসব বৈশিষ্ট্যগুলিকে আপাত অর্থে কাঠামোর অংশ বলে বিবেচিত করলেও এর অভ্যন্তরের Deep Structure-এর বৈশিষ্ট্যের শিকড়টা থেকে গেছে। পরিশেষে বলা যেতে পারে Deep Structure এর প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রনের বৈশিষ্ট্যগুলি উঠে এসেছে উপরিতলে। উপন্যাসের লেখক সচেতনভাবেই ম্যাজিক রিয়ালিজম পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। লেখক আমাদের ভাবনা-চিন্তাগুলিকে বাইরের বাস্তবে মান্যতা দিয়েছেন। অর্থাৎ বাইরের চিন্তার সঙ্গে ভেতরের চিন্তার বা বাইরের বস্তু বা জগতের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ জগতের আদান-প্রদান ঘটায়, এই চেষ্টাটাই হলো গুল্মলতার ইলেকট্রন। এই গুল্মলতার ইলেকট্রন হলো বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। আর এই ক্ষুদ্রতম অংশটি কোনো নিয়ম-নীতি মানে না শুধু প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের চারপাশে ভেঙেচুরে যাচ্ছে আর এই ভাঙাচোরা বিষয়টি হচ্ছে গুল্মলতার ইলেকট্রন। যেমন ইলেকট্রন যে বস্তুর ভেতরে অবস্থান করে, তার যে ক্রিয়া-কলাপ ঘটে, সে ক্ষেত্রে আমরা তা

কোনোভাবেই টের পাই না। আমাদের চিন্তার জগতটাও ঠিক একইরকম, ভেতরে ভেতরে কি হয়ে যাচ্ছে বাইরে থেকে তার কোনো হদিস পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে দেখলে বোঝা যায় মানুষ আসলে যে বাস্তবটাকে পর্যবেক্ষণ করে বা দেখে সেই বাস্তবের বাইরেও কিন্তু একটা অন্য বাস্তব রয়েছে যা চোখে দেখা যায় না—সেটাকে আমরা ম্যাজিক রিয়ালিজম বা পরাবাস্তবতা বলতে পারি। আর এই ম্যাজিক রিয়ালিজম-এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'গুল্মলতার ইলেকট্রন'।

কী বলে, মৃত্যুলগ্নে? : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'কী বলে, মৃত্যুলগ্নে?' উপন্যাসটিতে বাংলা উপন্যাসের যে ক্রমাগত ধারা সেটার আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আঙ্গিকগত দিক থেকে যেমন বদল ঘটেছে তেমনই বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও দেখা যায় আমূল পরিবর্তন। সাতের দশকের কথা শিল্পী সাধন চট্টোপাধ্যায়কে নতুন পথের অন্যতম পথিকৃৎ বলা চলে। লেখক তাঁর শ্রুতি লিখনে উপন্যাসটি সম্পর্কে যে জীবন ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন তা কি Text এ রক্ষিত হলো? লেখকের জীবন দৃষ্টি এবং প্রতিবেদনের আখ্যান সমভূমিতে অবস্থান করেছে কি। আখ্যানটির Surface Structure বিচার করলে উত্তর নৈতিবাচক হবারই সম্ভাবনা। কিন্তু Surface Structure ছাড়িয়ে Deep Structure এর জগতে প্রবেশ করলে ধারণা পাল্টাতে থাকে। উপন্যাসের আখ্যানে লেখক মানুষের বিচ্ছিন্নতার সত্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায় লেখক দেশকে ভেঙে দিয়েছেন অর্থাৎ আমরা যখন চিন্তা করি সেই সময় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থান পরিবর্তন করে যায়। একজন ব্যক্তি তার ভাবনা-চিন্তার জগত থেকে Time Space থেকে কীভাবে ভাঙতে ভাঙতে এখনো অতীতের দিকে এবং কখনো ভবিষ্যৎ কল্পনার জগতে এগিয়ে যায় তা লেখক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের মননশীল চেতনায় দেশ-কাল বদলে যাচ্ছে। এই যে ভাবনার মধ্যে দেশ-কাল বদলে যায় তার 'কী বলে, মৃত্যুলগ্নে?' একটা মৃত্যুর মুহূর্তে একজন মানুষ মারা যাচ্ছে তার ভেতর দিয়ে কিন্তু লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাসে বদল ঘটিয়েছেন।

অর্থাৎ আঙ্গিকগত বিচার বা রূপায়ণ পদ্ধতির দ্বারা দেখলে আলোচ্য 'কী বলে, মৃত্যুলগ্নে?' উপন্যাসটিকে ম্যাজিক রিয়ালিস্ট উপন্যাসের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ম্যাজিক রিয়ালিস্ট উপন্যাসের মতো এখানেও বাস্তব এবং কল্পনা তাল মিলিয়ে চলেছে। সর্বপ্রথম মনে হয়েছে লেখক

হয়তো কোনো বাস্তব জগতে আমাদের নিয়ে যাবেন। কিন্তু আসলে তা নয় আখ্যান যতই এগিয়ে যায় আমরা পাঠকরা ততোই বুঝতে সক্ষম হই যে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ মাটির দিকে অগ্রসর হতে চলেছে। তাই উপন্যাসের আখ্যানও বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তা বাস্তব জীবনের দলিলেই পরিণত হয়।

পরিবেশ সচেতনতামূলক উপন্যাস

কথাকার সাধন চট্টোপাধ্যায়ের পরিবেশ চেতনা মূলক উপন্যাস বলতে যে উপন্যাসগুলিকে আমরা জানি সেগুলি হলো—'জলতিমির', বিন্দু থেকে বৃত্তে', 'শেষ রাতের দেয়াল', 'গহিন গাঙ' প্রভৃতি। উপন্যাসে লেখক উন্মোচিত করেছেন একদিকে পরিবেশ ও অন্যদিকে বিপরীত মেরু লগ্নিপুঁজির সম্পর্ককে। তিনি স্বভাবতই স্পষ্ট করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লগ্নিপুঁজি ও ক্ষমতা তন্ত্রের বিভিন্ন উপকেন্দ্রগুলির স্বার্থনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং এইসব কিছুর অভ্যন্তরীণ চাপে কীভাবে স্বাভাবিক মানুষের জীবনযাত্রায় এক করুণ পরিণতি তৈরি হয় তার বাস্তবায়িত করতে।

জলতিমির : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির' উপন্যাসটি পরিবেশ চেতনার শিল্পভাষ্য। লেখক এই উপন্যাসটিতে পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক দূষণকে মিথের আশ্রয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসে দেখা যায় প্রান্তিক গ্রামবাসীদের কাছে আর্সেনিক দূষণ, জলে তার পরিমাণ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে পাঁচপোতা এবং আশেপাশের গ্রামের মানুষদের সচেতন করতে তাই বিজ্ঞান মঞ্চের মাধ্যমে সচেতন প্রচার শুরু করেন বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মীরা। বাণীতলা বিজ্ঞান মঞ্চের একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য রত্না মণ্ডলের নেতৃত্বে গ্রাম-বাংলার এই জনসচেতনতার সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা এবং আর্সেনিক দূষণ সংক্রান্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাটি আস্তে আস্তে জাতীয় স্তরে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই সমাজ সচেতন প্রচারকে লোকাল রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছে ষড়যন্ত্র বলে মনে হয়। এমনকি বিরোধী পক্ষের এটি চরম ষড়যন্ত্র বলে প্রচার মাত্রায় বাঁধা দান করেন। লেখক এর মাধ্যমে উপন্যাসটিতে একদিকে পশ্চিম বাংলার কায়েমি স্বার্থভোগী ক্ষমতাতন্ত্রের বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। আর অন্যদিকে রত্না মণ্ডলের বক্তব্য ও বিজ্ঞান মঞ্চের ভূমিকায় কৃষ্ণ ও কালীয় দমন মিথের ব্যবহারে আর্সেনিক সমস্যা চিরন্তন সমস্যার উৎপত্তি

হয়ে যায়। তাই লেখক কালীয়র নির্গত মৃত্যুজনিত গড়ল জ্বালায় উপমার দ্বারা আর্সেনিকের ভয়ংকর ইঙ্গিত করেছেন—

> ''কালীয় প্রথম আক্রমণেই সহস্র ফণার প্যাঁচে কৃষ্ণকে জড়িয়ে হ্রদের গভীরে নিয়ে গেল। ... সর্বনাশ হয়ে গেছে! কে কোথায় আছো!''[৩২]

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির' উপন্যাসে এই কালীয় দমন কাহিনি অনিবার্যতা ছিল না। আসলে লেখক মিথকে উপস্থাপন করার জন্যই কালীয় দমন কাহিনিকে স্থাপন করেছেন। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে এই আর্সেনিক দূষণ কি বা কীভাবে এর উৎপত্তি যা মানব সমাজে প্রতিফলিত হয়। যেমন মনে করা হয় জলের নির্বিকার অপচয় থেকে অথবা উচ্চ ফলনশীল ফসলের জন্য চাষের ক্ষেত্রে সেচের কাজে অত্যধিক পাম্পের জল ব্যবহার করলে জলস্তর নেমে যায়। এই জলস্তর নিচে নামতে নামতে আর্সেনিকের স্তরের জলে টান পড়ে যায় ওপর থেকে। ওপরের জলহীন স্থানে প্রবেশ করছে বায়ু। যখনই এই বায়ুর সংস্পর্শে আসছে আর্সেনিক স্তরে ঠিক তখনই রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে জল আর্সেনিকে পরিণত হচ্ছে। গড়লরূপী জলে দ্রবীভূত হয়ে উঠে আসে মহাপৃথিবীর কোলে। সেই জ্বালাময় বিষ জমির সেচের মাধ্যমে ফসলের ভেতরে প্রবেশ করে এবং এর ফলে ধীরে ধীরে খাদ্যশৃঙ্খলেও আবির্ভূত হয়। এই আর্সেনিক আবার কখনো কখনো পানীয় জলের মাধ্যমে সরাসরি অনুপ্রবেশ ঘটছে মানুষের শরীরে। আর আর্সেনিকের এই অভূতপূর্ব উৎসের কথা 'জলতিমির' উপন্যাসের সর্বাগ্রে পারিপার্শ্বিক জগতের মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন। এই আর্সেনিক মানবদেহে ছড়িয়ে পড়ার পর বিভিন্ন ভাবে মানুষ রোগ সংক্রমণের কবলে পড়ে। আর এর থেকে মুক্তির উপায় দিয়েছেন লেখক আলোচ্য উপন্যাসে। সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জলতিমির' উপন্যাসে আর্সেনিক দূষিত জল থেকে রেহাই পাওয়ার কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি এর থেকে সচেতন মূলক বিভিন্ন বার্তাও প্রদান করেছেন উপন্যাসে।

আখ্যানে দেখি রবিদাস পাড়াসহ আশেপাশের গ্রামের অনেকেই আর্সেনিকের শিকার হয়েছেন। এমনকি উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র অন্নপূর্ণাও আর্সেনিকের শিকার হয়ে অকালেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আর এই মৃত্যুর জন্য নিশ্চিত ভাবে দায়ী গ্রামের মানুষের অসচেতনতা,

অশিক্ষা এবং অজ্ঞতা। কিন্তু তার চেয়েও যারা বেশি দায়ী তারা হলো আঞ্চলিক স্তরের রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গরা। যা সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখনীতে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

বিন্দু থেকে বৃত্তে : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' উপন্যাসটি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে থেকেও এক বৃহত্তর জগতের পরিবেশ-পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক উপস্থাপিত করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গের এক নগ্ন বাস্তবতাকে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেমন লক্ষ করলে দেখা যাবে আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতে শব্দ দূষণের মতো ঘটনা নতুন কিছু নয়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে ঘুম থেকে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত শব্দ দূষণের মতো এক ক্ষতিকর জিনিসের সম্মুখীন হতে হয়। পরিবেশ বিনষ্টকারী বিভিন্ন দূষণকে মানুষ তোয়াক্কা না করে—নানা জায়গায় কলকারখানা স্থাপন করে চলেছেন। একদিকে যেমন শব্দ দূষণের মাত্রা বেগতিক হয়ে যায় অন্যদিকে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে থাকে। কলকারখানার এই দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক পদে যারা আসীন তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়। কেননা সমাজের দূষণ বিষয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে কলকারখানার মানুষের অধিকভাবে একটা লেনদেনের বিষয় জড়িত। তাই প্রশাসনিক কর্তারাও এই রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীদের যোগসূত্রের কারণে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পিছপা হয়। এর ফলে সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন ভয়ংকর পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচতে পারে না। যদি কোনো মানুষ সাহস করে প্রতিবাদে নামের উল্টে সেই মানুষটিকেই বিপদে পড়তে দেখা যায়। পাশাপাশি আমরা এও দেখেছি যে আজকাল পিকনিকের নাম করে অরণ্যের পরিবেশ কীভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কিছু মানুষ অরণ্যে পিকনিক করার নাম করে উচ্চ মাত্রায় মাইক বাজায়, যাতে বন্য পশু পাখিদের জীবন বিপর্যস্ত হয়, এমনকি রান্নার আবর্জনা, খাবারের খোসা প্রভৃতি সমস্তটাই সেই অরণ্যে তারা ফেলে আসছেন ফলে অরণ্যের পরিবেশেও নষ্ট হচ্ছে। এই অসচেতনতার বিরুদ্ধে সেভাবে কেউ এগিয়ে আসে না। কেননা এর পেছনে ক্ষমতা তন্ত্রের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কথাকার সাধন চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়গুলোকে নিজে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাঁর মনে হয়েছে এই বিষয়ে আলোকপাত করা খুবই প্রয়োজন। সেকারণেই 'বিন্দু থেকে বৃত্তে' উপন্যাসে প্রধান চরিত্র হিসেবে অংকিত সুধাময়—এমন একজন মানুষ যিনি তার চারপাশে ঘটে যাওয়া পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সবসময় প্রতিবাদে সোচ্চার থেকেছেন। কোনো বিরুদ্ধ শক্তি তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারেনি। উপন্যাসে আমরা

দেখেছি সুধাময় তার প্রতিবেশী জীবন সাহার বাগানে যে পার্থেনিয়ামের ঝাড় জঙ্গল বেড়ে উঠেছিল তা অস্বাস্থ্যকর জেনে প্রতিবাদ করেছিল। সুধাময় বলেন—

> "দক্ষিণের প্রতিবেশী জীবন সাহার বাগানে পার্থেনিয়ামের ঝাড় জঙ্গল হয়ে উঠেছিল আমি ওনাকে গাছটার অস্বাস্থ্যকর প্রভাবের কথা বুঝিয়েও যখন তাকাদা তৈরি করাতে পারিনি, নির্মূল করবার সামান্য অভব্য রূঢ় ভাষাতেই বলে ফেলেছিলাম—বড্ড ঠ্যাঁটা আপনি। ...জানেন ওর হাওয়া-বাতাসে কি হয়? খবর রাখেন? ...ওর গন্ধে আপনাদের ঘরেও তো হাঁপানি-অ্যালার্জি হতে পারে?"[৩৩]

আসলে সুধাময় পরিবেশ এবং মানবাধিকার আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। তিনি যখন পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হন তখন তার প্রতিবেশী নিখিলানন্দ ও তার পুত্র নিন্টুর সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। তাত্ত্বিক পরিভাষায় বলা যায় তারা আদতে Bainary Opposition। তাদের বিবাদের মূল কারণ জমিতে নির্মীয়মাণ কারখানা। কারখানা লোকালয়ে নির্মাণ হলে শব্দ দূষণ হবে, জল দূষিত হবে—এই ভাবনাটাই তাকে আত্মকেন্দ্রিকতার বিন্দু বৃত্ত থেকে বৃহৎ পরিসরে টেনে আনে। প্রথম দিকে যদিও নিখিলানন্দ ও নিন্টু এসব প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে। এসবই করে তারা ক্ষমতার দর্পে। কেননা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাকেন্দ্র তাদের করতলগত। কিন্তু সুধাময় পৌরসভা অফিসে শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে দরখাস্ত জমা করেন। তাকে কেউই থামাতে পারে না। তবে আখ্যানের শেষে সুধাময়ের দাদার মৃত্যু এবং দুজন হিন্দিভাষী ব্যক্তি বাড়িতে এসে শাসানোর ফলে সুধাময় ট্রমাটাইজড হয়। তারপর নিজের মনকে শক্ত করেন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছান—একটি কঠিন শব্দের জবাব দিয়েই ভবিষ্যতের পথ ঠিক করে নেবেন। উপন্যাসটি এক কথায় পরিবেশ চেতনার মহতী আখ্যান। লক্ষণীয় পাশ্চাত্য Ecological Novel এর মতো মানুষের জীবনে পরিবেশের ভূমিকার কথা এখানে নেই, পরিবেশ ও মানুষের একাত্মবোধের দিকটিও এখানে তুলে ধরা হয়নি। এর উপজীব্য বিষয় হলো বিভিন্ন ক্ষমতাতন্ত্রকে বশীভূত করে লগ্নিপুঁজির ধ্বজাধারীদের পরিবেশ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সচেতন জনৈক ব্যক্তি মানুষের প্রতিবাদ এবং তার পরিণাম।

শেষ রাতের শেয়াল : এই উপন্যাসটি হলো শিকড় সন্ধানের এক মহতী আখ্যান। আমরা আমাদের সমাজের চারপাশে প্রায়ই দেখেছি পুকুর বুঝিয়ে, নদী বুঝিয়ে, জলাশয় মাটি দিয়ে বন্ধ করে বাড়ি, ফ্ল্যাট, কলকারখানা স্থাপন করা হয়ে থাকে। উন্নয়নের নাম করে নদী গ্রাস করে সভ্যতার সর্বভুক ফণা। এই উপন্যাসের আখ্যানের ঠিক তেমনটাই ঘটেছে। লেখক তুলে ধরেছেন আমাদের এই যে পুঁজিবাদী ক্ষমতা তা কীভাবে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সব যুগেই সবকালেই এমন কিছু মানুষের সন্ধান আমরা পেয়েছি যারা প্রকৃতিকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন। আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র তরুবালা এমনই একজন মানুষ, যে দীর্ঘদিন আগে বুজিয়ে ফেলা সোনাই নদীর পুনরুদ্ধারের জন্য অনবরত চেষ্টা চালিয়ে গেছে। উপন্যাসের আখ্যান শুরু হয়েছে গ্রীনবেঞ্চে সোনাই নদীর একদা অস্তিত্ব নিয়ে জনস্বার্থ মামলার প্রসঙ্গ দিয়ে। ভাস্কর নাইয়া নামক একজন ব্যক্তি তরুবালার মনে এককালের পরিচিত নদী সোনাই-এর পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন জাগিয়ে দিয়েছিল। তরুবালা নদীটি পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করে। তবে এই আন্দোলনের সূচনালগ্নেই আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে জেগে উঠেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো। তারা তরুবালাকে শাসানোর চেষ্টা করেছে এবং মামলা তুলে নেবার জন্যও ভয় দেখিয়েছে। যদিও তরুবালা থেমে থাকেনি। তথ্য এবং প্রমাণ একত্রিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিল। নদীটির অস্তিত্বের একটা প্রমাণ দেওয়ার জন্য তরুবালা একটি দরগার খোঁজ পেয়েছিল। জেনেছিল যে এই নদীরই পাশে ঘনবসতি অঞ্চলে দেওয়াল ঘেরা দশ ফুট বাই আট ফুট একটা দরগা আছে, যেখানে ঐতিহাসিক সময়ে এক কলন্দরি পির নির্জনে সাধনা করতেন বসে বসে। তবে তরুবালা অনেক খোঁজার পর দরকার সন্ধান পেলেও উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে গ্রীনবেঞ্চে এর কোনো সুফল পায়নি। আসলে লেখক এই উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন জল সংরক্ষণ এবং নদীর বেঁচে থাকা মানব জীবনে কতোটা জরুরি।

তথ্যসূত্র :

১. দাশগুপ্ত, বাসব (সম্পাদিত) : 'নীল লোহিত', সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, কলকাতা-৪৯, বর্ষ-অনুল্লিখিত, সংখ্যা-১০, সেপ্টেম্বর-২০০২, পৃ. ৯৭

২. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা-২০১২, পৃ. ২১

৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৪

৪. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১ লা বৈশাখ ১৪১৮, পৃ. ২৫৩

৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৭২

৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৯৯

৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৭৬

৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩০৩

৯. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : 'পানিহাটা', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৯

১০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭

১১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৩

১২. প্রাগুক্ত : পৃ. ১১

১৩. হোসেন, পারভেজ : আকাশ এম. এম-ক্ষমতার প্রশ্ন ও মিশেল ফুকোর মতামত (মিশেল ফুকো পাঠ ও বিবেচনা), ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২০০

১৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫০

১৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৬

১৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৮

১৭. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খণ্ড), কলকাতা-০৯, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ. ১১

১৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯

১৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৩

২০. দাশগুপ্ত, বাসব (সম্পাদিত) : 'নীল লোহিত', সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, কলকাতা-৪৯, বর্ষ-অনুল্লিখিত, সংখ্যা-১০, সেপ্টেম্বর-২০০২, পৃ. ২০০

২১. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা-০৯, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা-২০১২, পৃ. ৪২৬

২২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪২২

২৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৮০

২৪. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা-০৯, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : দক্ষিণ পানশিলা ২০১৯, পৃ. ১৩৪

২৫. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪১৮, পৃ. ১৩৫

২৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৩৫

২৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৮২

২৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ২১৩

২৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯৭

৩০. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা-০৯, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা-২০১২, পৃ. ৯১

৩১. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা-০৯, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা-২০১২, পৃ. ২৫৩

৩২. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪১৮, পৃ. ৩৫০

৩৩. চট্টোপাধ্যায়, সাধন : উপন্যাস সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা-০৯, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : দক্ষিণ পানশিলা ২০১৯, পৃ. ১৮